Vol. 6 | No. 2 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকে জাতীয়তাবাদ

Volume	6
Issue	2
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nilima Ibrahim
Published online	December 16, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i2.5
Pages	151-205
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকে জাতীয়তাবোধ

নীলিমা ইব্রাহীম

পাক-ভারতের ভৌগোলিক পরিধি মহাদেশ তুল্য। সেইজন্যে সমগ্র ভারতকে অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত করে শাসনকার্য পরিচালনা করা খুব অল্প সময়েই সম্ভবপর হয়েছে। মহারাজা অশোক, হর্ষবর্ধন অথবা সম্রাট আকবর ইত্যাদি মহাবীরের পতাকা তলে মৈত্রীর বন্ধনে ক্ষণকালের জন্যে ভারতীয়েরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আবার পর মুহূর্তেই শাসকের বিশেষ কোনও দুর্বলতার ছিদ্র পথ ধরে এ বিশাল সাম্রাজ্য আবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

বিশাল ভারতের এ দ্রুত রাষ্ট্র পরিবর্তন এবং বিভিন্ন পথে বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষিবাহী জাতির আগমনে ভারতবর্ষে জাতিগত ঐক্য গঠন দৃঢ় ভিত্তিতে সম্ভবপর হয় নি। অবশ্য এ কথায় স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—ভারতবাসীর মনে কি তা'হলে দেশপ্রেম ছিল না? জাতিগত, দেশগত অথবা রাষ্ট্রগত ঐক্য কি প্রাচীন ভারতে দুর্লভ ছিল? এই যে দেশপ্রেম বা জাতীয়তা বোধ—যার ফলে আমরা আজাদী লাভ করেছি, সে কি বিদেশীর দান? অবশ্য এক কথায় এ সমস্যা বা প্রশ্নের মীমাংসা অথবা উত্তর সম্ভব নয়। কারণ সর্বপ্রথম তাহলে আমাদের এ বিচারই করতে হয় জাতীয়তা বোধ কি? দেশপ্রেমই বা কাকে বলে? কি ভাবে বা উপায়ে মানুষের মনে এ বোধ জাগ্রত বা উদ্বুদ্ধ হয়?

আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞান অনুযায়ী নানা কারণেই মানুষের মনে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হতে পারে। কখনও বা জাতিগত ঐক্য, কখনও বা ভাষাগত সাম্য আবার কখনও বা ধর্মীয় আদর্শগত অনুভূতির দ্বারা জাতীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে। অবশ্য জাতিগত ঐক্যই মানব সমাজকে সর্বাধিক দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করতে অক্ষম হয়। কখনও আবার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা বিশেষ এক মানব গোষ্ঠীকে এক সূত্রে আবদ্ধ করে। আবার উপরোক্ত একাধিক কারণে জাতিগত ঐক্য গঠিত হয়। অবশ্য রাষ্ট্রীয় একতা বোধই জাতি গঠনে সর্বাধিক সহায়তা করে। একই জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যে আবদ্ধ হয়ে এক সৌভাগ্যে গর্বিত হওয়া এবং দুর্ভাগ্যের অভিশাপ ভোগ করা—একত্রে রাষ্ট্রের উত্থানে উন্নত হওয়া এবং পতনে ধ্বংস হওয়াই

আমরা রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলে গ্রহণ করে থাকি। অন্য কথায় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্যধারাই জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করে।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ভৌগোলিক সীমারেখায় চিহ্নিত পাক-ভারত বিশাল ভূমি। এক শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে পুরুষানুক্রমে একই শাসনের পতাকাতলে এই জন-সমুদ্র শাসন করা ও তাদের সংযত, সংহত রাখা সম্ভব নয়। ইতিহাস থেকে আমরা অতি অল্প সংখ্যক ক্ষণজন্মা পুরুষের নাম করতে পারি যেমন চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, হর্ষবর্ধন, আকবর প্রভৃতি যাঁরা প্রায় সমগ্র ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের জীবনধারায় এ যেন মুহূর্তের সম্বল। সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী বিচার করলে বলা যায় যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধজনিত জাতীয়তাবোধ ভারতে কোনও কালেই দীর্ঘায়ু লাভ ক'রে নি এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস তার সাক্ষ্যও দেয় না। এই বিশাল সাম্রাজ্য বার বার খণ্ডিত হবার জন্যেই মুখ্যতঃ পাক-ভারতে জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য গঠিত হ'তে পারে নি।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য গঠনে দ্বিতীয় বাধা ভাষাগত অনৈক্য। গত ১৯২১ সালে ভারতের Linguistic Survey থেকে ভারতে একশত পঁচাত্তরটি ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং ভাষার ঐক্যসূত্রে জাতীয়তাবোধের বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা ভারতের পক্ষে শুধু অসম্ভব নয়, বাতুলতা মাত্র ছিল।

তৃতীয় বাধা ধর্ম। আজাদী পূর্ব অখণ্ড ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ধর্মীয় বিভাগ ছিল হিন্দু ও মুসলমান। এ ছাড়া জৈন, বৌদ্ধ, পারসিক, শিখ, ভারতীয় খ্রীস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হলেও নগণ্য নয়। এর ওপর হিন্দু-ধর্মের তিন শ'তেত্রিশ কোটি দেবতা ও তাঁদের শিষ্যদের আচার অনুষ্ঠানে যাবতীয় বিষয়ই বর্ণাশ্রম ধর্ম ও তা থেকে আগত পাক ভারতের জাতীয় ঐক্য গঠনের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। ধর্মীয় ঐক্যবোধে একত্রিত হবার কোনও পথই আর সেদিন ভারতীয়দের কাছে খোলা ছিল না। এ উক্তি যে কতদূর সত্য পাক ভারতের পৃথক অস্তিত্বেই তার প্রমাণ রয়ে গেছে। একমাত্র ধর্মীয় অনৈক্যের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। রাষ্ট্রীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধ এই ধর্মকেই কেন্দ্র করে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল।

অবশ্য প্রচীন ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ ছিল না—এ কথা স্পষ্ট উচ্চারণের বাধা অনেক। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি জওহর লাল নেহেরু তাঁর Discovery of Indiaতে

এর বিরুদ্ধ মত জানিয়েছেন। অবশ্য এ কথাও সত্য যে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে ভারতবাসীকে অনেক বারই একত্রিত হ'তে হয়েছিল। ইতিহাসে এ নজিরের সাক্ষ্য দেবেন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, রাজা পুরু, শিবাজী, রাণাপ্রতাপ, সিরাজুদ্দৌলা, মীর কাশিম প্রভৃতি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না যে বিশেষ এক শক্তিশালী বীরের নেতৃত্বে তাঁর পতাকাতলে সেদিন ভারতবাসী মিলিত হয়েছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। জাতীয়তাবোধে বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনজাগরণের বিদ্রোহ বা দেশরক্ষার ইতিহাস এ নয়। সুতরাং পণ্ডিতের এ উক্তি যুক্তিহীন নয় যে, ঃ "Inspite of the cultural unity of large parts of India in the middle ages, there was no unifying force strong enough either to bind her to-gether for defence or to give rise to any genuine nationality."

এ মতের ওপর ভিত্তি করে তিনি আরও একটু এগিয়েছেন ঃ[১]

It appears then none of the normal elements of nationality was present before nineteenth century......... That there was no Indian Nationality before the British Period.

এ প্রসঙ্গে এ কথাটিও স্মরণযোগ্য ঃ[২]

"We came and consolidation followed our footsteps. Diversities of race and religion found liberty and the spirit of a united India found rest to its harrassed wings. Under our protection India has enjoyed a recuperative quiet. If we cannot say that our rule has been a necessary factor in the development of Indian civilization, we can say that in the view of historical Indian conditions it has been a necessary evil"

অবশ্য ইংরাজ পণ্ডিত-মুখ নিঃসৃত এ ভাষণের সত্যতা আমাদের অস্বীকার করবার উপায় নাই। কারণ ইংরাজী শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি ও সুশাসন আমাদের একত্রিত না করলেও তাদের অত্যাচার, অবহেলা, ঘৃণা ও অবিচার যে পাক-ভারতের

১. British Impact of India. Sir Percival Griffiths P 243

২. The awakening of India. J. Ramsay Mc Donald PP 133-34

অধিবাসীদের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, এ উক্তিতে এতটুকু সত্যের অপলাপ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ করে বলেছেন ঃ[৩]

"ভাই পলিটিক্স ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুর বাড়ি আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল তাহাদের পলিটিক্স নাই।" বঙ্কিম প্রাচীন ভারতের গৌরবে যত গর্বিতই হোন না কেন, এ কথা সত্য যে পাঠান বাংলাদেশ জয় করবার সময় সত্যই ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এমনই নৈতিক অধঃপতন এসেছিল যে বিদেশীকে বাধা দেবার মত স্বাজাত্য বোধ, রাষ্ট্রীয় ঐক্য, স্বাধীনতা লিপ্সা অথবা ব্যক্তিগত মনোবল সেদিন কারও আর ছিল না। তাই গোপন পথে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করাই ছিল সেদিনের একমাত্র পলিটিক্স, কারণ নান্যঃ পন্থাঃ।

তারপর মুসলমান রাজত্ব কায়েম হবার পরও রাণা প্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কেরা খণ্ডভাবে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তখন মুসলমান বিজেতারাও আর বিদেশী ছিলেন না, তারাও ভারতীয় বলেই দাবী করেছেন, কারণ ভারতবর্ষকে তাঁরা নিজের দেশ বলেই মনে করেছিলেন। এ দেশের ঐশ্বর্য লুট করে নিয়ে বিদেশে অন্য কোথায়ও নিজেদের গৃহ স্থাপিত করেন নি। তাই এ দেশের মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গে এঁরা জড়িয়ে গিয়েছিলেন চিরতরে। সেজন্যে সিরাজুদ্দৌলা আমাদের জাতীয় বীর, মীর কাশিম দেশপ্রেমের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাই পাঠান বা মোগল সাম্রাজ্যে ছোটখাট যুদ্ধ-বিগ্রহ হলেও ব্যাপকভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জন-জাগরণের কোনও ঐতিহাসিক তথ্য বা সত্য পাওয়া যায় না।

ইংরাজ এদেশে এলো। বেনিয়া রূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একদিন বাংলার ও সমগ্র ভারতের সিংহাসন অধিকার ক'রে বসলো। ভারতবাসী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখলো বিদেশীকে। বাধা দেবার মত বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য সেদিনও তাদের ছিল না। সিরাজুদ্দৌলার পরাজয় আর এক সপ্তদশ অশ্বারোহীর কাহিনী। ঈর্ষা ও আত্মকলহে তখন বাংলার রাজনীতি চাপা পড়ে গেছে। দেশপ্রেম শব্দটি তখন বাংলার অভিধানে লুপ্ত। বিশ্বাসঘাতক রাজপুরুষেরা বরমাল্য দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে নিল ইংরাজকে; সিরাজ নিহত হলেন। ইংরাজ এলো কিন্তু মুসলমানের মত নিজেকে ভারতীয় ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রলো না। মুহূর্তের জন্য ইংরাজ ভুললে না

৩. কমলাকান্তের দপ্তর (পলিটিক্স) ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যে, তারা শ্বেতদ্বীপের অধিবাসী, শুভ্র তাদের গাত্র চর্ম। কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয়রা তাদের দাস, কারণ তারা বিজিত। ভারতের ঐশ্বর্য ধীরে ধীরে তারা কুক্ষিগত করে নিজের দেশে নিয়ে যেতে আরম্ভ ক'রলো। আহত পশুর মত অশিক্ষিত ভারতবাসী সে অত্যাচারের রূপ দেখতে লাগলো। কিন্তু এ কৃষ্ণমেঘেরও সুবর্ণদ্যুতি দেখা গেল। এ অনাচার, অবিচার ও অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের নব জাগ্রত ভাবধারা, ইউরোপীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা ধীরে ধীরে ভারতের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ ক'রে নিলো। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডির বীরত্ব গাথায় গাথায় উদ্দীপ্ত হয়ে, আইরিশ হোমরুলের সার্থকতায় ও সর্বোপরি বিদেশী শাসনচক্রের নিষ্পেষণে ভারতীয়ের চোখে এক নূতন আলোক রেখা ঝলকে উঠল। দাসত্বের স্বর্ণ শৃঙ্খল আজ তার কাছে বন্দীর লৌহ শৃঙ্খল বলে মনে হ'ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয়ের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌লো।

"Burke, Macaulay and Jhon Bright were to be the political oracles of Indian politicians for several decades while Paine and Mazini provided the emotional stimulus for the nationalist movement which throughout this period was at work only amongst the urban intelligentia."[১]

ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রথম অংশে ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার সংস্পর্শে শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজেকে ভুলে গেল—ভুলে গেল নিজের ধর্ম, নিজের জাতি নিজের দেশ, নিজের সমাজের কথা। এই কর্ণধারহীন হৃত-গৌরব বাংলায় এ সময়ে যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জাতিকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে এলেন, তিনিই বাংলার জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম প্রচারের আদিগুরু রাজা রাম মোহন রায়। দেশের ও দশের উন্নতির জন্যে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং সেকালের উদারচেতা ইংরাজ মনীষীদের সহায়তায় বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার পথ প্রবর্তিত হ'ল। এই শিক্ষার প্রভাব ও প্রভাবের ফল ধীরে ধীরে ফলতে আরম্ভ ক'রলো।

"It has thus not only given biographies of Garibaldi to India but also revived the worship of heroes like the

১. The British Impact on India. Sir Percival griffiths P 245

Maharana Protap, the lion hearted Rajput who resisted the Muhammadans as Hereward resisted the Normans.”[২]

এ উক্তি অতিরঞ্জন নয় যে কয়েকজন ভারত-হিতৈষী ইংরাজ যেমন স্যার চার্লস্ মেটকাফ্, স্যার জন্ ম্যাল্‌কম, লর্ড মেকলে প্রভৃতির চেষ্টায় ভারতে শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হ'ল।

পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টি দিয়ে ভারতকে উন্নত ক'রবার আন্তরিক বাসনা এঁরা হৃদয়ে পোষণ করতেন। এমনিভাবে ধীরে ধীরে শুধু ইংলণ্ড বা ইউরোপ নয় সমগ্র দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার দ্বার ভারতীয়দের সামনে অবারিত হ'ল।

প্রকাশ্যে ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস অঙ্কুরিত হ'ল কয়েকজন ভারতবাসীর ইংলণ্ড ভ্রমণের দ্বারা। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে দাদভাই নৌরজী ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ইংলণ্ড যান এবং ১৮৬৯ সালে এক নব চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর মুখ থেকেই প্রথম ভারত শাসনে ভারতবাসীর অংশ গ্রহণের অধিকার লাভের দাবী ধ্বনিত হ'ল।

কিন্তু দাদাভাইয়ের প্রত্যাগমনের পূর্বেই ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিল। এ দুর্যোগ সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। “একে মিথ্যাই বলা হয় সিপাহী বিদ্রোহ। এর নেতারা নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপা, ঝাঁসীর রাণী, কুমার সিংহ প্রভৃতি সিপাহী ছিলেন না। এটি ছিল সশস্ত্র প্রয়াস বা অশান্ত আন্দোলন।” শুধু সেপাইদের ক্ষেপিয়ে তোলা বা দেশের ধ্বংস আনাই এদের উদ্দেশ্য ছিল না, নতুন রাস্ট্র গড়ে তোলার আশাতেই এঁরা আন্দোলন পরিচালনা ক'রে ছিলেন। ১৮৫১ সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। রাজা রাধা কান্ত দেব হলেন সভাপতি আর মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এর সম্পাদক। ভারতের গণজীবনে জাগরণের এই হ'ল সুরু বা সূচনা। আমরা ভারতীয়, আমাদের নিজেদের ইষ্ট-অনিষ্ট সম্পর্কে মতামত জানাবার অধিকার ন্যায় সঙ্গত হওয়া উচিত,—এ চেতনা সেদিন বৃহৎ ভারতের পটভূমিকায় বাঙ্গালী মনেই প্রথম জেগেছিল।

অবশ্য সিপাহী বিদ্রোহে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বাংলায় আন্দোলন অপেক্ষাকৃত কমই হয়েছিল। বহরমপুর ও রাণীগঞ্জ ছাড়া অন্যান্য অংশে বিদ্রোহ

২. The awakening of India. J. Ramsay Mc Donald P 136

অতি ক্ষীণই ছিল। কিন্তু সমগ্র ভারতের পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস মুখ্যতঃ বাংলারই ইতিহাস। বাংলা যেমন প্রথম দাসত্বের শৃঙ্খল গলায় পরেছিল তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলন যজ্ঞে সর্বাপেক্ষা অধিক ত্যাগ ও আত্মাহুতি দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। মহাত্মা গোখলে ঠিকই বলেছেন—"what Bengal thinks to-day, the rest of India thinks to-morrow"।

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেছেন ঃ[১]

"বাংলার চিন্তাধারা আজ হোক কাল হোক সমগ্র ভারতবাসীকে অনুবর্তী করাইবেই, আর বঙ্গবাসীই যে সর্বাগ্রে প্রথম হইতে স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলা যে স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা, এ সত্য এ দেশের কেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেছেন ঃ[২]

"If Bengal could unite leaders and agitators, the system of our rule in India would change as by magic."

কিন্তু বাংলার এই জাতীয় চেতনা বোধের উৎস কোথায়? কোন্ বীর অথবা স্বদেশ প্রেমিকের উদাত্ত আহ্বানে বাঙ্গালী দেশহিত ব্রতে দীক্ষা নিয়েছিল। এখানে জাতীয় বীর অথবা মুক্তিদাতা বীরেরা নীরব। বাংলায় জাতীয়তাবাদ প্রচারের মন্ত্র এসেছিল বাঙ্গালী সাহিত্যিকের মসী থেকে, বীরের অসি থেকে নয়। বাঙ্গালীর কাব্য, নাটক, উপন্যাস—সাহিত্যের সর্বশাখা দেশাত্মবোধের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর গণমানসে। এই সাহিত্যের মাধ্যমে রূপ পেয়েছিল শিক্ষিত বাঙ্গালীর মাতৃমুক্তি মন্ত্রের বাণী। আর অগণিত জন সাধারণ সেই মন্ত্র ধারণ করে খুঁজেছিল দেশ মুক্তির পথ।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 'ইয়ং' বেঙ্গলদের ভেতর পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা যাঁকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছিল, সর্ব দেহ মনে যিনি ছিলেন ইংরাজ, দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের অনুভূতি কিন্তু সর্ব প্রথম বাণীরূপ পেলো তাঁর লেখনীতে।

মুখ্যতঃ টডের রাজস্থানের কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে মধুসূদন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করলেন ১৮৬১ সালে। ১৮৫৭-৫৮ সালে পৌষ সংখ্যা 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' নামে একটি প্রবন্ধ

১. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১ম খণ্ড)—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ৪৬-৪৭

২. The awaking of India—J. Mc. Donald P 70.

প্রকাশিত হয় এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মিনী' উপাখ্যানও সম সাময়িক কালের প্রকাশ। রাজস্থানের ইতিহাস ছাড়াও উপরে উল্লেখিত প্রবন্ধ ও কাব্য উভয়ই মধুসূদনকে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। 'মেঘনাদ বধ কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক' একই বছরে রচিত হয়। ভাবের দিক থেকেও উভয়ের ভেতর দেশপ্রেমের অনুভূতি বিকশিত হতে দেখি। রাবণ বলেছে—

"যে শয্যায় আজ তুমি শুয়েছ কুমার,
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে।
সদা, রিপুদল বলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে সমরে।" [১ম সর্গ মেঘনাদবধ কাব্য]

আবার চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনাচ্ছলে রাবণ বলেছেন ঃ

"এ বিলাপ কভু দেবী সাজে কি তোমারে ?
দেশ বৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গ পুরে বীর মাতা তুমি,
বীর কর্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে।" [১ম সর্গ. মেঘনাদবধ কাব্য]

ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ও পাশ্চাত্য বীরদের কাহিনী পাঠ করে মধুসূদনের অন্তরেও যে বীর-পূজার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়েছিল এবং দেশকে ভালবাসবার এক উদগ্র কামনা তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন, উপরোক্ত ছত্রগুলি সে ভাবদ্যোতক। স্বদেশপ্রেম প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য না হলেও এ ভাব যে কবি-হৃদয়কে প্রণোদিত করেছিল এ সত্য স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ঃ[১] "মধুসূদনের স্বদেশ প্রীতি ও রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বেদনাবোধ কৃষ্ণকুমারী নাটকে অবিসন্দিগ্ধভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ভীম সিংহের খেদে আমরা যেন মধুসূদনের অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি নাই।"

অসহায় নৃপতি ভীম সিংহের দ্বারে শত্রু উপস্থিত। রাজকুল লক্ষ্মীর অবমাননায় রাজ অন্তর সতত চঞ্চল ও বিমর্ষ। দেশের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তপস্বিনীকে ভীম সিংহ বলেছেন—" (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি এ ভারত ভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ডঃ সুকুমার সেন। পৃঃ ৮৪

কোনও মতেই এ বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন তা বলতে পারিনে। হায়! হায়! যেমন কোনও লবণাম্বু তরঙ্গ কোনও সুমিষ্ট বারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবন দলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর আপদ হ'তে কখনও অব্যাহতি পাবো।" [২য় অঃ ১ম গঃ]

'কৃষ্ণকুমারী নাটকের' এ বীরপূজাই রাবণের উক্তিতে আমরা পেয়েছি। কৃষ্ণকুমারী নাটকে যে ভাবের বীজ রোপিত হ'ল 'মেঘনাদ বধকাব্য' তারই পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপ। মেঘনাদের বীরত্ব গাথা ও রাবণের দেশ প্রেম যে সেদিন সমস্ত বাঙ্গালী রসিক চিত্তকে জয় করতে সমর্থ হয়েছিল, তার মুখ্য কারণ সেদিনের বাঙ্গালীর বীর পূজাকাঙ্ক্ষী হৃদয়। রামায়ণের রামকে মধুসূদন হীন বীর্য করতে চান নি, বাল্মীকির আদর্শচ্যুতি তাঁকে পৌরাণিক সত্যভঙ্গে অপরাধী ক'রলেও সেই সত্যস্খালনই সেদিন মধুসূদনকে বিজয়ী ক'রেছিল। সুদূর অযোধ্যা থেকে আগত রাম সমুদ্র পার হয়ে যে লঙ্কার ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রবেন, এ ভাব মধুসূদন তাঁর স্বদেশ প্রেমিক অন্তর দিয়ে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি যেন সেদিন প্রত্যক্ষ দিবালোকে ভারতের ভাগ্য দর্শন ক'রলেন। এ যেন সেদিনের ইংরাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত, পরাজিত ভারতবাসীর ইতিহাস। ইংরাজ সভ্য, সুচতুর হ'লেও তার পরাধীনতা ভারতের পক্ষে কলঙ্ক। এই অপমানের জ্বালা মাইকেল অনুভব ক'রেছিলেন তাঁর হৃদয়ে। এ সত্য তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন যে দেশকে জাগাতে হবে, দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, নইলে দেশের মঙ্গল, দেশের কল্যাণ সুদূর পরাহত। সেইজন্যেই শতাব্দীর দৃঢ়বদ্ধ ধারণায় রামকে বাঙ্গালী যে অবতারত্ব দান করেছিল, মধুসূদন তাঁকে সেই দেবত্বের সিংহাসন থেকে চ্যুত করে সাধারণ মানবীয় গুণে ভূষিত করেন। এই আদর্শচ্যুতির জন্য কিন্তু সেদিনের উন্নত হৃদয় বাঙ্গালী তাঁকে অপরাধী করলো না, অভিশাপ দিল না, অধিকন্তু বীর মেঘনাদকে ও রাবণকে সাদরে আহ্বান করে নিল তাদের নব জাগ্রত জাতীয় বীর রূপে। তাই ভীমসিংহ দেশরক্ষার জন্য কন্যা বিসর্জন দিলেন, তার নিধনে অনুমতি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি, তবুও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরবর্তী কালের কবি, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার যে দেশপ্রেমের প্রদীপকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর রূপে প্রজ্বলিত করেছিলেন, মধুসূদন

তাঁদের পথ প্রদর্শক। কৃষ্ণকুমারীতে যে ভাবের জন্ম, মেঘনাদ বধ কাব্যে তারই পূর্ণ প্রকাশ।

মধুসূদনের আদর্শে কাব্য রচনা করলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরবাহু হলেন আদর্শ বীর। আত্মত্যাগ ও আহুতির অপার মহিমা কীর্তন করলেন কবি। দেশের জন্যে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গের উদাত্ত আহ্বান জানালেন তিনি 'বৃত্র সংহারে'।

নবীনচন্দ্র সেন দেখলেন, বৃহত্তর অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় আমরা সে বাণী পেয়েছি ঃ

"এক ধর্ম রাজ্য পাশে বেঁধে দিব আজি
খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত" (শিবাজী উৎসব)

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণও এই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ধর্মগুরু শ্রীভগবান কৃষ্ণকে আমরা নবীন-কাব্যে দেশনেতা ও রাষ্ট্রীয়-চেতনা উদ্বুদ্ধকারী দীক্ষাগুরু রূপে পাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অবহেলা করে অর্থাৎ সংস্কারের নাগপাশে আবদ্ধ সঙ্কীর্ণতার সীমা লঙ্ঘন করে বৃহত্তর ভারত গঠনের আদর্শই ছিল নবীন সেনের কাব্য নায়ক শ্রীকৃষ্ণের। এ কাব্যেও নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে দেব মাহাত্ম্যচ্যুত করে মানবীয় গুণে ভূষিত করেছেন, জাতীয় জাগরণের মন্ত্র প্রচারের জন্যে। পুরাণের কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী হতে পারেন না, কিন্তু জাতীয় জাগরণের নেতা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্বের মোহমুক্ত হয়ে ক্ষাত্রবীর্য প্রচার করলেন। দেশকে জাগিয়ে তুলতে হবে, ধর্মের বর্মে আবৃত করে স্বদেশবাসীর অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে মাতৃভক্তি, দেশপ্রেম, বীরত্ব, শৌর্য বীর্য, দেশের জন্য, ভারতের সংহতি রক্ষার জন্য বীরমন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে ভারতের জনগণকে। তাই মধুসূদনের মত পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করলেও দেবতাকে মানবত্ব দান করে নবীনচন্দ্র মানবীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন।

যুগ ধর্মকে হৃদয় দিয়ে এঁরা উপলব্ধি করেছিলেন এবং আপামর শিক্ষিত জনের হৃদয়ে সেই ভাবধারা স্রোতই বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন এ যুগের কবি সাহিত্যিকেরা। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর যে ভাবধারা অর্থাৎ মানবতার জয়গান বাংলার সমাজ জীবনে প্রবেশ করেছিল, সুভদ্রা চরিত্রের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখতে পাই। মানব প্রেম, স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ সেবা, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম বিহ্বল ভক্তিগদগদ চিত্তকে আমরা খুঁজে পাই সুভদ্রাচরিত্রে। এজন্যেই আমরা দেখতে পাই রঙ্গলাল মাইকেল, হেম, নবীন,

কাব্যে যে আদর্শ প্রচার করলেন, তা হল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মনের যুগাদর্শ —দেশপ্রেম, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির আহ্বান।

কাব্যক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত যে দেশপ্রেমের সঙ্গীত গাইলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদের কণ্ঠে সেই সুরই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

এই রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বেদনাবোধেই জন্ম নিয়েছিল রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস সমূহ। রাজস্থানের কাহিনীকে মধুসূদন সাহিত্যে যে স্থান দিলেন পরবর্তী-কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি সেই পথ অনুসরণ করেই জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম প্রচারে ব্রতী হলেন।

নাট্য সাহিত্যেও দেশপ্রেম প্রচারে মধুসূদনই যে পথিকৃৎ, এ আমরা কৃষ্ণ-কুমারীতে দেখেছি। এ শাখায় তাঁকে অনুসরণ করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল। ভারতীয় স্বাধীনতা-সূর্যের গৌরব-রশ্মি বিকিরিত রাজপুতনা মুসলিম বিজয়ের বিরুদ্ধে শেষ বিদ্রোহী রাণা প্রতাপ হলেন সেদিনের আরাধ্য বীর। বাঙ্গালী মনের এই নব জাগৃতি স্বদেশপ্রেমের এই নব অনুভূতিতে জন্মলাভ করলো ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিপুল সাহিত্য শাখা—কাব্যে, উপন্যাসে ও নাটকে।

নাটক সৃষ্টিতে মধুসূদন ইতিহাসের বুকে কল্পনার তুলি স্পর্শে জাতীয় বীর চরিত্রের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচার করলেন। শীঘ্রই গণজাগরণের এক প্রচণ্ড আঘাতে বাংলার নাট্য-শিল্প কল্পনার রঙিন স্পর্শ ত্যাগ করে বাস্তবভূমিতে পদার্পণ করলো।

এ সময়ে ইংরাজ সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব উপায়েই তাদের শোষণ নীতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। নীল কুঠির সাহেবদের অত্যাচারে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। বাঙ্গালী চাষী ক্রন্দনরোল বাইরে প্রকাশের অধিকার পেলো না। রুদ্ধ আবেগ ও দুঃখময় দীর্ঘশ্বাস ভেতরে ভেতরে গুমরে মরতে লাগলো। কিন্তু সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। জীবনে গৃহচ্যুত হবার চরমক্ষণে বাংলার চাষী বিদ্রোহী হল। যশোহর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে এই আন্দোলন ব্যাপক বিদ্রোহরূপে দেখা দিল। সরকার একেবারে উদাসীন থাকতে পারলেন না। উচ্চ শিক্ষিত বহু ভদ্র সন্তানও এ অত্যাচারকে অবলম্বন করে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর স্যার জন পিটার গ্রাণ্টের অনুমতিতে সীটনকারের সভাপতিত্বে 'ইণ্ডিগো কমিশন' নিযুক্ত হল। এই কমিশন নিরপেক্ষ বিচারের গৌরবলাভ করলো। নীলকুঠির সাহেবরাই দোষী সাব্যস্ত হলেন। জোর করে নীলের দাদন

রহিত হল। বাংলার চাষী তাদের জমি ফিরে পেলো, ফিরে পেলো খাদ্য-শস্য ও জন্মভিটার প্রতি অধিকার, পেলো নতুন করে বাঁচবার আশা ও প্রেরণা।

এই স্বাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে বাংলার কৃষককুল যাঁর কাছে সবচেয়ে ঋণী তিনি বাংলার খ্যাতনামা নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।

॥ ২ ॥

'নীলদর্পণ' সমালোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম লিখেছেন ঃ[১]

"নীলদর্পণ" বাংলার Uncle Tom's Cabin। "টম কাকার কুটির" আমেরিকার কাফ্রীদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীলদর্পণ নীল চাষীদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়াই নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী।"

নীলদর্পণের পূর্ণ পটভূমিকা জানতে হলে নাট্যকার দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা আবশ্যক। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সেকালের সমাজে যে সকল শিক্ষিত যুবক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি কামনা করে লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য-শিষ্য ছিলেন। দীনবন্ধু এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী।

দীনবন্ধু পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টে ইন্‌স্‌পেক্টরের কাজ করতেন এবং এজন্যে প্রায়ই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাঁকে ভ্রমণ করতে হত। সাহিত্যিক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দীনবন্ধু কার্যোপলক্ষে অনেক জায়গা ভ্রমণ করেছেন। বঙ্কিমের ভাষায় ঃ[২]

দীনবন্ধুকে কার্যানুরোধে মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত, দার্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্যে গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্বক সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আহুরীর মত গ্রাম্য বর্ষিয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নসীরাম ও রতার্ মত গ্রাম্য

১. দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী ভূমিকা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২. ,, ,, ,, ,, ,, ,,

বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত শিক্ষিত শহুরে মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য-শোণিত-পায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী নদের চাঁদ হেমচাঁদের মত "উন পাঁজুরে বরাখুরে" হাপ্ পাড়াগেঁয়ে হাপ্ শহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডিপুটি, নীলকুঠীর আমীন দেওয়ান, তাগাদ্‌গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা কাওরাণীর মত লোকের পর্যন্ত তিনি নাড়ী নক্ষত্র জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক হাজির করিতে পারিতেন—আর কোনও বাঙ্গালী লেখক তেমন পারেন নাই।"

দীনবন্ধুর এ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিত হল গণ-আন্দোলন। নীল চাষের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্যে যিনি প্রথম লেখনী ধারণ করেন, তাঁর নাম হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরিচালিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায় নীলকরদের নির্মম, নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনীও তাহার আশু প্রতিকারের জন্য তিনি সরকারকে আহ্বান জানান। হরিশচন্দ্র সম্বন্ধে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ[১]

"অবিরত সংবাদ পত্রে লিখিয়া, ইংলিশম্যান ও হরকরার সহিত বিবাদ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়া, বড়লাট, ছোটলাটকে সদুপদেশ দিয়া হরিশচন্দ্র নিজের স্বাস্থ্য, অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। 'ইণ্ডিগো কমিশন' গঠন ও নিষ্ঠুর আইনের রদ ব্যাপারে তিনি প্রাণপাত করেন আর তাঁহার চেষ্টা বিশেষভাবে ফলপ্রসূও হয়।"

এই হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত এক ঘটনা থেকে দীনবন্ধু তাঁর নাটকীয় কাহিনী সংগ্রহ করেন। পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে আর্চিবল্ড্ হিল নামে জনৈক ইংরাজ হরমণি নামে এক কৃষক কন্যাকে পুকুর থেকে জল আনবার সময় জোর করে ধরে কুঠিতে নিয়ে যায় এবং রাত দুপুর পর্যন্ত তাকে বন্ধ করে রাখে। এ ছাড়া দীনবন্ধু নীলদর্পণ রচনায় 'আলালের ঘরের দুলালের' কাছেও ঋণী। এই উপন্যাসে বর্ণিত নীলকরের অত্যাচারের কাহিনী এমন কি ভাষা পর্যন্ত দর্পণকারকে নাটক রচনায় প্রেরণা দান করেছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নীলদর্পণ সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ[২]

প্রজাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই হৃদয়ে যে আগুন তখন জ্বলিতেছিল তাহা তাঁহারও হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। হৃদয়ে তাই অগ্নি লইয়াই তিনি নীলদর্পণ লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।"

১. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—(১ম খঃ) ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ১৬

২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী পঃ ২৮০

১৮৬০ সালে নীল দর্পণ ঢাকায় প্রকাশিত হয়। সরকারের কাছ থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার ভয়ে নাট্যকারের নাম গোপন রাখা হয়েছিল। নাটকের আখ্যাপত্র এরূপ ঃ 'নীলদর্পণং নাটকং। নীলকর বিষধর দশন কাতর প্রজানিকর। ক্ষেমাঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিঃ প্রণীতনং। ঢাকা, শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাদাং ১৭৮২।২ আশ্বিন। বাংলার জাতীয় জাগরণের নেতৃবৃন্দের জন্মভূমি পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে এই নাটকের প্রথম প্রকাশ ও অভিনয়ে বাংলা দেশে এক চাঞ্চল্যকর সাড়া পড়ে গেল। ডঃ হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ[১]

"His drama was in fact the mirror as its name Darpana signifies that held up the full reflection of apprehension and tortures practised by the haughty and defiant planters." নীল দর্পণ নাটকের পাত্রপাত্রী অধিকাংশই বাস্তব চরিত্র। হরমণি ও আর্চিবল্ড্ হিল এর কথা আগেই উল্লেখ ক'রেছি। নবীন মাধব নদীয়া জেলার চৌগাছিয়া গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের ছায়া; আর হার্সেল সাহেব 'অমর নগরের নিরপেক্ষ ম্যাজিস্ট্রেট্'। নাটকের সবগুলি চরিত্র বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি যেমন সাধুচরণ তোরাপ, আতুরী, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, পদীময়-রাণী সবাই যেন সজীব প্রাণধর্মে জীবন্ত ও প্রাণচঞ্চল।'

নীলকরের অত্যাচার বর্ণনায় সাধুচরণ গোলক বসুকে বলেছে — 'গতবারে আপনার ধন গিয়েছে এইবারে মান যাবে।

গোলক। মান যাওয়ার আর বাকী কি? পুষ্করিণীর চার পাড়ে চাষ দিয়েছে। এইবার নীল কর্বেই। তাহলে পুকুরে যাওয়া বন্ধ হ'ল। আবার সাহেব ব্যাটা বলেছে যদি পূর্ব মাঠের ধানী জমি কয় খানায় নীল না বুনি তবে নবীন মাধবকে সাত কুঠির জল খাওয়াবে।'

এ উক্তি থেকে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, নীল কুঠির সাহেবদের হাত থেকে সম্পন্ন গৃহস্থদেরও মুক্তি ছিল না। এরা যে মনুষ্যত্ব বর্জিত পশু ছিল, সম্ভবত দীনবন্ধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তা দেখেছিলেন ও জেনেছিলেন, তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ক্ষেত্রমণির কাতর উক্তিতে ঃ—'ও সাহেব তুমি মোর বাপ।' উত্তরে নরপশু যা বলেছে তা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হ'লেও সেকালে কুঠিয়াল ইংরাজ চরিত্রে সম্ভবত অবাস্তবতার দোষ আনেনি। সেকালের যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত

১. Indian stage Vol. II Dr. H. N. Das Gupta P 91

এলাকার মোরেল, রেইনী প্রভৃতি কুঠিয়াল সাহেবের কাহিনী মোরেলগঞ্জ ও খুলনায় আজও কিংবদন্তী রূপে প্রচলিত আছে। নীলকুঠির নীলমাম্‌দোরা হয়ত অনেকে এদের চেয়েও নিষ্ঠুর, হীন, নীচ ও পাশববৃত্তি সম্পন্ন ছিল। এখানে নাট্যকারের সত্য প্রকাশের বলিষ্ঠ সাহসের পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত না হ'য়ে পারি না। কুঠিয়াল সাহেবের চরিত্র স্বয়ং বঙ্কিম চন্দ্রও রূপ দিয়েছিলেন। ফষ্টর চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ ক'রলেও দীনবন্ধুর মত ক'রে মসীলিপ্ত করতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিম সাহসী হননি। কিন্তু সরকারী চাকুরীর মোহে বা রাজ রোষের ভয়ে সত্য উদ্ঘাটনে দীনবন্ধু পশ্চাদপদ হন নি।

এ প্রসঙ্গে নন্দগোপাল সেনগুপ্তের একথাগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ[১]

''যেহেতু তাঁর প্রকৃতিতে মাইকেলের মত শিক্ষাভিমান এবং বঙ্কিমের মত জাত্যাভিমান ছিল না, সেইজন্য তিনি সমাজ জীবনের নিম্নতম স্তরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশতে পেরেছিলেন। এই প্রত্যক্ষ সংশ্রব তাঁকে দিয়েছিল সৃষ্টির প্রেরণা এবং এখানে থেকেই তিনি আহরণ ক'রেছিলেন তাঁর সৃষ্টির উপকরণ। একদিকে বঙ্কিম যখন রাজা বাদ্‌শাদের, বীরদের সন্ন্যাসীদের মহিমান্বিত কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন আর মাইকেল লিখেছেন দেবদেবী ও তাঁদের সমকক্ষ নরনারীদের জীবন নিয়ে কাব্য, দীনবন্ধু সেই দিনে কি ক'রে নিরন্ন চাষার দুঃখে বিগলিত হ'য়ে 'নীলদর্পণ' লিখলেন, ভেবে সত্যিই অবাক হতে হয়। আজকে কোমর বেঁধে গণ-সাহিত্য সৃষ্টির রেওয়াজ হয়েছে। কিন্তু যেদিন আবহাওয়ায় তার বাষ্পটুকুও ছিলনা, সেদিন উদার মনুষ্যত্বের প্রতি এই সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকানোর প্রেরণা এলো কোথা থেকে? এর মূলে ছিল দীনবন্ধুর মন এবং দৃষ্টির সহজ প্রসন্নতা যা বিলাতি শিক্ষার বা বর্ণাশ্রমিক আভিজাত্যের অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হয় নি, সত্যকার জীবন ও বেদনাবোধ থেকে যার জন্ম।''

দীনবন্ধুর হৃদয়-মথিত সহানুভূতিই তাঁকে গণ-দেবতার পূজায় নিয়োজিত করেছিল। উদার, সহজ, সরল, হাস্যপ্রিয় প্রাণের দ্বার সবার জন্যই ছিল উন্মুক্ত। দু'হাতে ভালবাসা বিলিয়েছেন, প্রতিদানে পেয়েছেনও অনেক। নইলে সামান্য দীনহীন প্রজার দুঃখে তাঁর হৃদয় এমন করে কাঁদবে কেন? অবশ্য এই অতি সহানুভূতি আবার সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দীনবন্ধু যে নীল চাষীদের

১. বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত পৃঃ ১১৭

দুঃখে দুর্দশায় বিগলিত হয়ে তাঁর নাটক রচনা করেছেন, এ দিবালোকের মত স্পষ্ট সত্য, কারণ নাটকের প্রথমেই তার উল্লেখ আছে। তাই যাদের দুঃখে তাঁর অন্তর কেঁদেছিল, তাদের দোষগুণ বিচার করবার শক্তি সেদিন দীনবন্ধু হারিয়েছিলেন। অবশ্য এ দুর্বলতা দীনবন্ধুর একার নয়, এ মানবীয় দুর্বলতা, সর্বজনে প্রযোজ্য। তাই সাহিত্য সমালোচকেরা বলেন, প্রচারধর্মী বা আদর্শদ্যোতক সাহিত্য সৃষ্টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একদেশদর্শী হয়। অর্থাৎ প্রচার স্বপক্ষে যুক্তি যেমনই রূঢ় হয়, প্রতিপক্ষ সম্পর্কে দোষারোপে মানুষ তেমনই অন্ধ হয়ে যায়। এই অতিরঞ্জন দোষ ও একদেশ দর্শিতা দীনবন্ধুর সৃষ্টিকে স্পর্শ করেনি, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তাঁর যুক্তি সমর্থনের জন্যেই অনেক জায়গাতেই তিনি সম্ভবত সত্যের অপলাপ ও নাট্যসমূহের নিয়মাবলীও লঙ্ঘন করেছেন। Uncle Tom's Cabinও এই অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন বর্জিত নয়। সেখানেও লেখিকার সুকোমল, সুপ্রসন্ন অন্তরের দরদ তাকে সত্যে প্রলেপ দান করেছে। প্রচারকের আসনে উপবিষ্ট হয়ে দীনবন্ধুকেও প্রতিপক্ষের উপর একান্তভাবেই নিষ্ঠুর হতে হয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের বাঁধা রীতি কতটুকু ব্যাহত হয়েছে বা তাঁর সৃষ্টির আঙ্গিকধর্মিতা ব্যাহত বা রক্ষিত হয়েছে কিনা, সেদিকে দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ দীনবন্ধুর ছিল না। অত্যাচারীর অত্যাচার বর্ণনা করতে তিনি চেয়েছেন। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকখানিই দীনবন্ধুর ছিল, এসঙ্গে তাঁকে সহায়তা করেছে কবি দীনবন্ধুর সুদূর কল্পনা প্রসারী চিত্ত। তাই যেটুকু দেখেছেন তাতো এঁকেছেনই আর যেটুকু তাঁর বাস্তব দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল হৃদয়ের সহানুভূতির জারকরসে কল্পনাবৃত্তিকে সিক্ত করে সে শূন্য স্থানকেও তিনি বর্ণসমারোহে পূর্ণ করেছেন। এ শিল্প কর্মে প্রচলিত সাহিত্যিক রীতির অনুমোদন তিনি পাবেন কিনা, অতদূর চিন্তা করবার অবকাশ তাঁর ব্যথা-কাতর, সংবেদনশীল মনের ছিল না। 'নীলদর্পণ' সমালোচনায় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন ঃ[১]

"নীলদর্পণ এইরূপ করুণ রসপূর্ণ হইলেও ইহা যে নাটকাংশে সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ নাটকের সকল অংশই অভিনেয় হওয়া উচিত, কিন্তু প্রজাদিগের উপর শ্যামচাঁদ ও রামকান্ত প্রহার, গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির উদরে মুষ্টাঘাত, উড়ানী পাকান দড়িতে গোলকচন্দ্রের মৃতদেহ দোদুল্যমান রাখা, গলায় পা দিয়া সরলতাকে হত্যা করা প্রভৃতি কাণ্ড সকল অভিনয়ের যোগ্য হইতে

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব — রামগতি ন্যায়রত্ন পৃঃ ২৯৯

পারে না। ইংরেজী নাটকে এ সকল সম্পূর্ণ দোষাবহ হয় না বটে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ওরূপ কাণ্ড সকল রঙ্গস্থলে দর্শকদিগের উত্তেজক হয় বলিয়া নেপথ্যে সম্পাদন করিয়া সংস্কৃত নাটক রীতির অনুসরণ করাই কর্তব্য।"

অবশ্য এ সমালোচনা ভিত্তিহীন নয়। মঞ্চের ওপর এমন সব দৃশ্যের অবতারণা —যার থেকে লোকের মনে ভীতি বা ঘৃণা উৎপাদিত হয়, তা বর্জন করা সব দেশের নাট্যকলা শাস্ত্র অনুমোদিত। কিন্তু নীলকরের অত্যাচারকে স্পষ্ট করে আপামর জন সাধারণের চোখের সামনে এমন করে তুলে ধরতে হবে, যেন সে অনুভূতি তাদের হৃদয়ে আঘাত হানে, মর্ম বেদনা জাগরিত করে। তাই দীনবন্ধু অত্যাচারের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত নিঃশেষে নিঙড়ে এনে দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছেন।

কয়েকটি দৃশ্য ত্রুটিপূর্ণ হলেও 'নীলদর্পণ' নাটক রচনায় নাট্যকারের চরিত্র-সৃষ্টি-প্রচেষ্টার বিকাশ দেখা যায়। দীনবন্ধুর পূর্ববর্তী অন্য কোনও নাট্যকারের সৃষ্টিতে সমালোচনা বা বিশ্লেষণের উপযোগী চরিত্র পাওয়া যায় না। এখানে দীনবন্ধুর সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টি প্রশংসনীয়। তবে দীনবন্ধুর রচনায় উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রগুলিই অধিকতর বাস্তব ও প্রাণ স্পর্শী হয়েছে। রাইচরণ, তোরাপ ও আদুরী দীনবন্ধু-সৃষ্ট চরিত্রগুলির ভেতর উৎকর্ষের দাবী রাখে। দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতিই এর মূল কারণ।

নীলদর্পণ প্রকাশিত ও অভিনীত হ'ল। চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ মটনকারের অনুমতিতে এই নাটক ইংরাজীতে অনূদিত হ'ল। শর্মিষ্ঠাখ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্ত রেভারেণ্ড লঙের অনুরোধে আশাতিরিক্ত দক্ষতার সঙ্গে এই অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এই অনুবাদের ফলে মহাকবি মধুসূদন ও সেকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সৌহার্দ্য দৃঢ়মূল হয়। এ অনুবাদের সার্থকতা সবিস্তারে মাইকেল জীবনীকার যোগেন্দ্রনাথ বসু বর্ণনা করেছেন। এ অনুবাদ শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ রইল না। F. H. Shrine নামে জনৈক ইংরাজ ইংলণ্ডে আর একখানা অনুবাদ প্রকাশিত করেন। শ্বেতদ্বীপ বাসীদের এ অপমান ও লাঞ্ছনা ইংরাজ সরকার নীরবে সহ্য করলেন না। লঙ্ কারারুদ্ধ হ'লেন, সীটনকার হ'লেন অপদস্ত আর কবি মাইকেল হলেন লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত।

কিন্তু এই বিচার উপলক্ষ্য ক'রেই ভারতের বুকে যে জাতীয় জাগরণ ও গণচেতনার উন্মেষ হ'ল পরিণামে তাই আজ আমাদের মুক্ত জলমাটি দান করেছে।

লঙ্ সাহেবের মামলার বিচার করেছিলেন বিচারপতি মরডাণ্ট্ ওয়েল্স্। তিনি এ মামলার রায় প্রসঙ্গে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে উপলক্ষ্য করে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছিলেন। চারদিক থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হ'ল। ১৮৬১ সালের ২৯শে আগষ্ট রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভার আহ্বান করা হ'ল। সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া-র কাছে মরডাণ্ট্ ওয়েল্স্-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হ'ল। অবশ্য বৃটিশ প্রতিনিধি ভাইসরয় বিচারপতি মরডাণ্ট্ ওয়েল্স্‌কে সমর্থন করে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের কাছে এ প্রতিবাদের উত্তর দিলেন। কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। ১৮৬২ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে পাই যে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া সার চার্লস উড্ এই অভিযোগের উত্তরে ভাইসরয়কে লেখেন ঃ

"Those who hold the judicial office may be sensible of how great importance it is that their denunciation of crime may not be interpreted into hasty importations against a whole people or country." ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়ের বিচার প্রার্থনা সেদিন কল্পনার বস্তু ছিল। কিন্তু নীলদর্পণের অভিনয় সেই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিল। ইংরাজের অত্যাচার ও জুলুমের প্রতিবাদ জনগণের মুখে এই প্রথম উচ্চারিত হ'ল। এ ঐতিহাসিক জাগরণ হ'য়েছিল বাংলার নাটক নীলদর্পণকে অবলম্বন ক'রেই।

তোরাপের মুখের কথা, আদুরীর স্বাভাবিকতা, পদী ময়রাণীর মনস্তত্ত্ব দীনবন্ধুকে যথার্থ শিল্পীর গৌরব দান করেছে। বাঙ্গালী এ নাটকের মাঝে নিজেকে চিনতে পেরেছে। অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী, শিক্ষিত বাঙ্গালী, শহুরে বাঙ্গালী জেনেছে যে দেশের অগণিত অশিক্ষিত মুর্খ চাষা তাদের ভাই। এ আপামর জনগণের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গেই তাদের অদৃষ্ট একই বন্ধনে আবদ্ধ।

গণবিক্ষোভের ফল অচিরে ফললো। নীলের দাদন বন্ধ হ'ল। গণসাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে বাংলার মঞ্চের ইতিহাস স্থাপিত হ'ল। সমবেত প্রচেষ্টায় National Theatre নীলদর্পণকে অবলম্বন করেই প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বাংলার জেলায় জেলায় এ নাটকের অভিনয়, পুনরাভিনয় হ'তে লাগলো। বাঙ্গালী শুনলো

জাগরণের প্রভাতী সংগীত। বাঙ্গালী জেগে উঠলো। এই প্রথম বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মনে জাতীয় ঐক্য অনুভূত হ'ল ব্যাপকভাবে। ইংরাজের অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ভারতীয়দের এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য সূত্রে বেঁধে দিলো।

॥ ৩ ॥

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রাম 'ওহাবী' আন্দোলন নামে পরিচিত। সমগ্র ভারতের বুকে পুনরায় একচ্ছত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়াসেই এ আন্দোলনের উদ্ভব। বিজেতা ইংরাজ বিজিত মুসলিমের সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রে এসেছিল, তাকে উদার বা মহৎ অন্তত বলা যায় না। একদিকে যেমন ইংরাজের দাম্ভিকতা তাদের প্রতিনিয়ত পীড়িত করতে লাগলো, অন্যদিকে তেমনি বিজিতের অভিমান ও ক্ষোভ নিয়ে ইংরাজের সভ্যতা, কৃষ্টি ও শিক্ষা থেকে অনেক দূরে তাঁরা সরে রইলেন। সে জন্যে ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অনেক পেছনে রয়ে গেলেন। পরাজয়ের গ্লানি থেকে আর একবার মুক্তির প্রচেষ্টাই ভারতীয় মুসলিম জাতির মুক্তি-আন্দোলন রূপ পেলো 'ওহাবী আন্দোলনে। কিন্তু এ আন্দোলন শুধু মুসলমান সম্প্রদায়কে অবলম্বন ক'রেই গড়ে উঠেছিল বলে একে সর্বজনীন ভারতীয় আন্দোলন বলা যায় না। ইংরাজ শাসনের অবসানের প্রচেষ্টায় মুসলিম জাতি আর একবার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ধর্মীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু ক'রলো। নেতা আমীর খাঁ পরাজিত ও বন্দী হ'লেন। বিচারপতি নরম্যান্ তাঁর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দিলেন। আমীর খাঁ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু এ বিচারের দুঃখ, ক্ষোভ ও জ্বালা ওহাবীরা সহসা ভুলতে পারলো না। বীর আবদুল্লাহ্ নরহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রলো নরম্যানের শোণিতে নিজের হাত রঞ্জিত ক'রে। ইংরাজ আবদুল্লাহ্‌কে ফাঁসি দিলো, কিন্তু বীরের প্রতি সম্মান দেখাবার মত আন্তরিক উদারতা সেদিনের বেনিয়া ইংরাজ দেখাতে পারলো না। ধর্মীয় রীতিতে আবদুল্লাহ্‌র শেষ কৃত্য সমাপ্ত হ'ল না। প্রতিহিংসা পরায়ণ নর-শোণিত-পিপাসু ইংরাজ আবদুল্লাহ্‌র দেহকে ভস্মীভূত ক'রে নরম্যান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রলো।

'ওহাবী' আন্দোলনের পর মুসলমান আবার নতুন ক'রে ইংরাজের বিষ দৃষ্টিতে পড়লো। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পরাজিত, লাঞ্ছিত মুসলমানও ইংরাজ পদলেহনে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলো না। ফলে ভারতীয় মুসলমান দিন দিন হীনবল হ'তে লাগলো। ১৮৬৩ সালে 'ওহাবী' আন্দোলন দমন করা হ'ল কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকের মন থেকে এ স্বপ্নমায়া ও স্বাধীনতার কামনা বিদূরিত হ'ল না।

১৮৭৩ সালে মীর মশারফ্ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটক প্রকাশিত হয়। সেকালের সমাজে ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশে নীলদর্পণের মত গুরুত্বপূর্ণ না হ'লেও জমিদার দর্পণের স্থানও নগণ্য বা অবহেলার নয়।

যদিও সাহিত্যের ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ—"কি ওহাবী আন্দোলন কি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কোনও ইঙ্গিতই মীর সাহেবের সাহিত্যে পাইনে, না পাওয়ার কারণ তাঁর নিছক সাহিত্যপ্রীতি ও শিল্পানুরাগ।" এ মতের প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকলেও মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণে' এর সমর্থন পাওয়া যায় না। মনে হয় ইংরাজ অত্যাচারে লাঞ্ছিত, অবমানিত, পদদলিত ভারতীয় মুসলিমের অন্তরের প্রজ্বলিত রোষবহ্নিরই বাহ্যিক প্রকাশ। জমিদার দর্পণে, সুতরাং এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে 'জমিদার দর্পণ' ওহাবী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ ফল।

দীনবন্ধুর মত জীবনে সহজ বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র মীর সাহেবের সামনেও প্রশস্ত ছিল। অন্ন সংস্থানের জন্য তাঁকে ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে এবং দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করতে হয়। ফলে বাংলার দরিদ্র, মূর্খ, নিরন্ন চাষীর সঙ্গে একটা সহজ যোগাযোগের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। জমিদারীর শাসকেরা যে কি করে শোষকে পরিণত হন, প্রজাবৎসল জমিদার কি ভাবে সন্তান-বাৎসল্য প্রকাশ করেন এবং তার স্বরূপ কি, তা মীর সাহেব কয়েকটি বাস্তব চিত্রের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু যে প্রজাদের ওপর অবিচার অত্যাচার তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা নয়, ইংরাজের আদালতের বিচারের সঙ্গে তাঁকে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে হয়েছিল। জমিদারীর মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে প্রায়ই তাঁকে আদালতে যেতে হতো এবং সেখানে বিচারের নামে যে প্রহসনের অভিনয় তিনি ইংরাজ বিচারকদের করতে দেখেছেন, হুবহু তারই চিত্র তিনি নাটকে রূপ দিয়েছেন। 'আলালের ঘরের দুলালে' বিচারের নামে যে প্রহসনের দৃশ্য আমরা পেয়েছি, তার চেয়েও ঘৃণিত চিত্র পাই মীর সাহেবের 'জমিদার দর্পণে'। জমিদার দর্পণে একদিকে সর্বহারা বাংলার চাষীর নিঃস্ব, রিক্ত রূপ আর অন্যদিকে বিচারের ও শাসনের নামে ইংরাজের যথেচ্ছচারিতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

শতাব্দীর প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও প্রজার অন্তর-মথিত দীর্ঘশ্বাসে আজ বাংলার জমিদারের সিংহাসন টলেছে। ওই সিংহাসনের পদতল যে প্রতিদিন কত হতভাগ্য

নরনারীর শোনিতে রঞ্জিত হয়েছে, কত মূক প্রাণীর বোবা আর্তনাদে তাদের প্রাসাদ ভিত্তি কম্পিত হয়েছে, কত লোক গৃহহারা স্ত্রী-পুত্রহারা হয়ে পথের ভিখারী হয়েছে, সে ইতিহাসের সংখ্যা সীমা নাই। কারণ সেদিনের ভারতে মূল্য ছিল জমিদারের প্রাণের, তাঁর চলার পথের রথচক্রতলে বাধা অপসারিত করবার জন্যে যদি কয়েকটি দরিদ্র হতভাগ্যকে ধরণী বক্ষ থেকে চির বিদায় নিতে হয়, তাতে জমিদারের করবার কি আছে? রাজ্য শাসন ও পরিচালনা রাজধর্ম—মনু থেকে মহাভারত এ দেশ-বাসীকে সেই নির্দেশই দিয়েছে। প্রত্যেক প্রজার সুখ-দুঃখের হিসাব রাখবাব মত অনাবশ্যক, অফুরন্ত সময় তাঁদের কোথায়?

১৯১৯ সালে বাংলার ইতিহাসে প্রথম প্রজার করুণ ক্রন্দনধ্বনি রাজকর্ণ গোচর হয়। মন্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্মে এই প্রথম হতভাগ্য চাষীদের স্বার্থের কথা উপস্থাপিত হয়, কিন্তু জমিদারের উদ্ধত গর্বিত হুঙ্কারে সে ক্ষীণ ধ্বনি লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর ১৯৩৫ সালে যখন ধর্মীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত আইন সভা গঠিত হল, তখন বহু সংখ্যক মুসলিম সভ্য অগণিত চাষীর দাবী নিয়ে তাদের প্রতিনিধি রূপে পরিষদ কক্ষে পদার্পণের অধিকার পেলেন। ১৯৩৮ সালে বাংলার চাষীর দাবী কিছু কিছু গৃহীত হল। সব শেষে জমিতে চাষীর পূর্ণ অধিকার বর্তালো আজাদী লাভের পর জমিদারী উচ্ছেদের ফলে। জনগণের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় আন্দোলনকারীরা দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের কাছে ঋণী, তেমনি প্রজাস্বত্ব অধিকারের জন্য মীর মোশারফ হোসেনের কাছেও বাঙ্গালী কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

১৮৭৩ সালে জমিদার দর্পণ নাটক প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত রীতিতে নাটকের প্রস্তাবনায় নাট্যকার তাঁর নাটক রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। এ অংশে শুধু যে রচনার উদ্দেশ্যই ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, এ স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে মীর সাহেবের সহজ প্রসন্ন অন্তর, তাঁর সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত মন। নিম্নোদ্ধৃত অংশ তাঁর অন্তরের পরিচয় জ্ঞাপক ঃ

"সূত্রধর। কথা এমন কিছু নয়, কলিকালে প্রজারা মহাসুখে আছে। কলিরাজও প্রজার সুখ চিন্তায় সর্বদাই ব্যস্ত। কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে এরই সন্ধান কচ্ছে´ন। কিন্তু চোখের আড়ালে সবলেরা যে কত অত্যাচার কত দৌরাত্ম্য কচ্ছে, তার খোঁজ খবর নেই।

নট। কেন? এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল, দুর্বল, ছোট বড়, ধনী, নির্ধনী, সুখী, দুঃখী সকলি সমান। সকলি সম স্নেহের পাত্র,

সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজকাল আবার দীন-দুঃখীদের প্রতিই বেশী টান।

সূত্র। (ক্ষণকাল নিঃস্তব্ধে) আচ্ছা, মফঃস্বলে এ রকম জানোয়ার আছে জানেন। তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে, শহরে কুকুর কিন্তু মফঃস্বলে ঠাকুর। শহরে তাদের কেউ চেনে না, মফঃস্বলে দোহাই ফেরে। শহরে কেউ কেউ জানে যে, এ জানওয়ার বড় শান্ত, বড় ধীর, বড় নম্র, হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, মনে দ্বিধা নেই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফঃস্বলে শ্যাল, কুকুর, গরু, পর্যন্ত পার পায় না। বলবো কি জানোয়াররা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

* * * *

এরা আবার দুই দল।

নট। দল আবার কেমন?

সূত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট। ঠিক বলেছেন। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চমকে ওঠে। এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক!"

এই রকম এক গ্রাম্য জানওয়ার অর্থাৎ জমিদার হায়ওয়ান আলির কীর্তিই 'জমিদার দর্পণ' নাটকের মূল বিষয় বস্তু। এই নাটক রচনায় নাট্যকার মশারফ হোসেন যে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর কাছে ঋণী, এ কথা সর্বতোভাবে স্বীকার্য। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের ভক্তদাস চরিত্রের সঙ্গে হায়ওয়ান আলি চরিত্রের সাদৃশ্য বর্তমান। উভয়েই সঙ্গতিসম্পন্ন, কিন্তু হীনরুচির বশবর্তী হয়ে পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত। তবে দু'জনের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভক্তদাস ধর্ম ও সমাজ ভয়ে ভীত, কিন্তু হায়ওয়ান আলির বাহ্যিক ব্যবহারে নামাজ প্রীতি দেখা গেলেও অন্তরে খোদার স্পর্শ আছে বলে অনুভূত হয় না।

বলপূর্বক পরস্ত্রী হরণ আমাদের নীলদর্পণের দুর্বৃত্তদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য সে যুগে সাহিত্যে অনুকরণ বা অনুসরণ সমালোচনা গ্রাহ্য ছিল না। দীনবন্ধু অনুসরণ করেছেন মধুসূদনকে, আর মশারফ হোসেন অনুসরণ করেছেন দীনবন্ধুকে। কিন্তু নাটকের সমাপ্তিতে মীর সাহেব তাঁর বৈশিষ্ট্য দেখাতে চেয়েছেন। ভক্তদাস মাইকেলের হাতে সংস্কৃত হয়ে ধর্মপথে এলো, দীনবন্ধুর মাহাত্ম্যে রোগ

সাহেবের দল নীল চাষ ত্যাগ করে চাষীদের বাঁচবার পথ করে দিলো। কিন্তু পাষণ্ড পাপাচারীর সহায়ক ইংরাজ বিচারকের বিচারে হায়ওয়ান আলি নির্দোষ প্রমাণিত হল। তাই অন্যায়ে ও পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হায়ওয়ান আলি জামালকে বলেছে—"তার জন্যে ভয় কি? মকর্দমা আছে, মামলা আছে, আমি আছি। যত টাকা লাগে বেপরোয়া জান কবুল"। [২য় অঃ ৩য় গঃ]
এরা জ্ঞান-পাপী জেনে শুনে অন্যায় আচরণ করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। সামন্ত তান্ত্রিক সভ্যতার এও একটা মর্মদাহী দিক।

বিচার দৃশ্যে মীর সাহেব যে কলঙ্কময় দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, তা আমাদের পূর্ব পরিচিত। মিথ্যা সাক্ষীর সমাদর, আসামীর উকিল ব্যারিষ্টারের প্রতি বিচারক জজ সাহেবের সহৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার, আমাদের ইংরাজ শাসনের প্রথমদিকের অরাজকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নুরুন্নাহারের মৃতদেহ ময়না তদন্ত পেশ করা সম্পর্কে ডাক্তার ও বিচারকের আলাপ আলোচনার ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ চরিত্রের এক কলুষিত দিক অত্যন্ত নগ্নভাবে আত্ম প্রকাশ করেছে। ডাক্তার আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছে ঃ

If fever can produce enlargement of the spleen, then why not the sob of blood will produce sanguinous apoplexy of the brain?" এরূপ অর্থহীন নির্লজ্জ প্রলাপ ইংরাজের সংলাপে যুক্ত করে লেখক তাঁর অন্তরের ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশের পথ খুঁজেছেন। অবশ্য এদিক থেকে আপন দেশবাসীর প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতিই দীনবন্ধুর মত মশারফ হোসেনকেও অতিরঞ্জন দোষ ও পক্ষপাতিত্বের অপরাধে অপরাধী করেছে। উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ চরিত্রের কলঙ্ক কালিমাকে বাইরে প্রকাশিত করে তাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞা জাগিয়ে তোলা। এবং সে কাজে মীর সাহেব তাঁর পূর্বসূরীদের মত সাফল্যের দাবী করতে পারেন।

চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে মশারফ হোসেন দীনবন্ধুকেই অনুসরণ করেছেন। তবে ভাষার লালিত্য বৃদ্ধি ও সংগীত সংযোজনা মীর সাহেবের নিজস্ব শিল্পী কুশলী মনের পরিচায়ক।

প্রজার দুঃখ দুর্দশা বর্ণনা, জমিদারের অকথ্য, অমানুষিক অত্যাচার, ইংরাজের অশাসন ও কুশাসন এবং বিচারের নামে প্রহসন প্রভৃতি বাস্তব সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন

করে সেকালের সমাজে মশারফ হোসেন যে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, সে কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় কৃষককুলের দুঃখ বর্ণনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র এমন অকুণ্ঠিত চিত্তে জমিদারদের কার্যাবলীর এমন সত্য ও স্পষ্ট সমালোচনা করতে পারেন নি। বাংলার কৃষক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ[১]

"আমার এই প্রবন্ধের জন্যে হয়ত সমাজ-শ্রেষ্ঠ ভূস্বামী মণ্ডলীর বিরাগ ভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে ঘটুক। যদি সেই ভয়ে 'বঙ্গদর্শন' কাতরের হইয়া কাতারোক্তি না করে—পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে—যদি কোনও প্রকার অনুরোধের বশবর্তী হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয় ততই ভাল।" সত্য কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ঠিকই। কিন্তু ভূস্বামীদের বিরাগভাজন হবার সঙ্কোচের কথাও গোপন রাখতে পারেন নি। একই প্রবন্ধে বঙ্কিম আদালত সম্পর্কে বলেছেন ঃ[২]

"আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থে নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্যাম্পের মূল্য চাই, উকিলের ফিস চাই, সাক্ষীর খোরাকী চাই। সাথীদের পারিতোষিক আছে। হয়ত আমীন-খরচা লাগিবে এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছুর প্রত্যাশা রাখেন।" বঙ্কিমচন্দ্র সে সত্যের ইঙ্গিতমাত্র দান করেছেন, পূর্ণ প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। সত্যসন্ধী নাট্যকার নির্ভীক চিত্তে সে রূঢ় বাস্তবকে রূপ দিয়েছেন। বাংলার জাতীয়তাবাদ প্রচারে, ইংরাজ শোষণের প্রতিবাদে মশারফ হোসেনের বলিষ্ঠ কণ্ঠও মূল্যহীন নয়।

এরপর ধীরে ধীরে ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টায় রইলো। বাংলার বুকে ক্ষুদ্র বৃহৎ সঙ্ঘ ও সমিতি জন্ম নিতে লাগলো। কলিকাতা মহানগরীও নীরব রইলো না। কলিকাতায় এক মহৎ আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠানে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্রে মিলিত হলেন। ১৮৬৭ সালের হিন্দু-মেলার অনুষ্ঠানের কথাই আমি বলছি। এ উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাজ-নারায়ণ বসু ও মুখ্যত ঠাকুর পরিবার। তাঁদের পরিকল্পনা আংশিক সফলতা অর্জন করলো। দেশী শিল্পজাত দ্রব্যে মেলা পূর্ণ হ'ল।

১. বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ) 'বঙ্গ দেশের কৃষক' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ২৪২
২. " " " " " " " ২৪৭

সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের মনে দেশজননীর প্রতি এক নিবিড় ভক্তি ও পরস্পরের প্রতি এক দৃঢ় ঐক্যের বন্ধন স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা গেল। জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশনে সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর গাইলেনঃ

"মিলে সব ভারত সন্তান, এক তান মন প্রাণ।
গাও ভারতের যশোগান॥"

দ্বিতীয় অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হ'লঃ

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান।
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান॥"

শিল্প মেলার অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে ভারতের নেতারা জনসাধারণকে কোন্ পথে চালিত করতে চাইলেন, এই সঙ্গীতের পদগুলির ভেতর দিয়েই সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা চলে। যদু গোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেনঃ[১]

"১৮৬৭ সালে হিন্দু মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও স্বাবলম্বনের ভাব দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনা এবারে নবকুমার মিত্র কার্যকরী করলেন।"

দিকে দিকে রজনী সেনের রচিত সঙ্গীত মাতৃমন্ত্রের রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেঃ

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন-দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

এ ধরণের সঙ্গীতের মুর্ছনা বাঙ্গালীর মনে এক নব প্রেমের বার্তা জ্ঞাপন করলো। বাঙ্গালী জাতীয় জাগরণের গান শুনলো। নতুন করে যেন আবার সে জানতে পেলো—সে বাঙ্গালী, সে ভারতবাসী, মাতৃভূমিতে বিদেশীর শাসন পাশ মুক্ত করায় তারও একটা নিজস্ব কর্তব্য আছে। আছে মায়ের কাছে তার স্বকীয় বিশেষ দাবী। হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান সম্পর্কে ডঃ হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত লিখেছেনঃ— "১৭৮৮ শকে (১৮৬৭ খ্রীঃ) এই মেলার প্রথম প্রতিষ্ঠা। ইহার দ্বিতীয় বৎসরের বিবরণীতে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বিবৃতি পাঠ

১। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৮

করেন, তাহাতে জানা যায় যে হিন্দু জাতিকে একত্র করা ও আত্ম নির্ভরতা শিক্ষা দেওয়াই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কাহারও কাহারও মুখে স্বাধীনতা কথাটারও অস্ফুটধ্বনি হইয়াছিল। বস্তুতঃ জাতির ঐক্য স্থাপনেই অনুষ্ঠাতাগণ বিশেষরূপে মনোযোগী ছিলেন।"

এই সময়ে সাহিত্যিক জগতের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের আত্মপ্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং জাতীয়তাবাদ প্রচারে ও মাতৃমন্ত্রে দীক্ষাদানে লেখনী ধারণ করলেন। তাঁর 'আনন্দ মঠ ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলার জাতীয় জীবনে দেশপ্রেম ও রাজনীতির বোধ জাগ্রত করলো। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রয়োজন ও তার থেকে জন্ম নিল একতাবদ্ধ হবার ঐকান্তিকী প্রচেষ্টা।

বাংলার জাতীয় জাগরণের এই সঙ্কটময় অথচ উদ্দীপনাময় মুহূর্তে বাংলার রঙ্গমঞ্চও নিশ্চেষ্ট রইলো না। ১৮৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মহাধুমধামে শিশির কুমার ঘোষের 'ভারতমাতা' নাটকের অভিনয় হ'ল।

অবশ্য নাটকীয় শিল্প কৌশল ও আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার ক'রলে 'ভারত মাতা'কে নাটকীয় পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া চলে না। সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে ভারত মাতার দীনাহীনা অবস্থার কথাই প্রচার করা হ'ল এ নাটকে। এ সঙ্গীতে শুধু ভারতের দুরবস্থার কথাই ব্যক্ত করা হয়নি, পরোক্ষে ভারতবাসীর দেশাত্ম বোধকে জাগ্রত করাই হ'ল নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতীয়তাবাদ প্রচারে শিশির কুমার ছিলেন সে যুগের একজন অগ্রগামী নায়ক।

নাটকের দৃশ্যে জীর্ণ-শীর্ণ সন্তান পরিবৃত দুঃখিনী ভারত মাতার চিত্র বর্ণনা করেই নাট্যকার ক্ষান্ত হন নি। ষড়ৈশ্বর্যময়ী ভারতলক্ষ্মীর পাশ্চাত্ত্য যাত্রার উৎসবও দেখান হয়েছে। এর মর্ম নিহিত অর্থোদ্ধার সেদিন কোনও বাঙ্গালীর কাছেই কষ্টসাধ্য ছিল না। এ ছাড়া কোনও সুসংবাদ কাহিনী চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস বা নাটকীয় চরিত্রের বাহ্যিক অথবা আত্মিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রচেষ্টা এতে নেই। এ নাটিকা চিত্রধর্মী। কয়েকটি খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে শাসিত ও শাসক ইংরাজের সম্পর্ক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শিশির কুমারেরপ্রচেষ্টা সার্থক হল। এ নাটকের অভিনয় দেখে বাঙ্গালী নিজেকে সুপ্ত, অর্ধমৃত ভারত-সন্তানরূপে চিনতে পারলো। নাটকে জাতীয় জাগরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত ধারায় চললো।

বাংলার এই জাতীয় জাগরণের শুভ মুহূর্তে এগিয়ে এলেন পণ্ডিত ও বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই সময়ে দেশে ফিরে এলেন। সবাই চাকুরী গ্রহণ করলেন। কিন্তু ইংরাজের দেওয়া পরাধীনতার লৌহ শৃঙ্খলকে সুরেন্দ্রনাথ স্বর্ণ শৃঙ্খলরূপে গ্রহণ করতে পারলেন না। পদে পদে তাঁর কার্যকলাপে সরকারী নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল। সরকারও সুপ্ত রইলেন না। সুরেন্দ্র নাথের কার্যকলাপের ওপর কঠিন দৃষ্টি রাখা হল। কিন্তু কোনও তরফই কৃতকার্য হতে পারলেন না। নিজের স্বাধীনতাকামী অন্তর ও উচ্চ পদের মর্যাদার সঙ্গে বিরোধে আত্মিক সত্তাই জয়লাভ করলো। সুরেন্দ্রনাথ পদত্যাগ করে দ্বিগুণ উৎসাহে দেশহিতব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। দেশমাতৃকার সেবাকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও ঠিক এক সময়ে এক ক্ষুদ্র ঘটনা তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাকে এক সুনিয়ন্ত্রিত দৃঢ় পথে পরিচালিত করলো। বঙ্কিম কিছুদিন বহরমপুরে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন কোর্ট থেকে ফিরবার পথে কর্নেল ডাফিন নামক এক সৈন্য বিভাগীয় কর্মচারীর হাতে ডেপুটি বঙ্কিম লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হলেন। বঙ্কিমের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল—আত্ম-চৈতন্য জাগ্রত হল। স্বদেশ ও স্বসমাজের উন্নতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করলেন।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে দেশীয় যুবকবৃন্দের প্রচেষ্টায় Indian association স্থাপিত হল। এর আগেই শিশির কুমার ঘোষের উদ্যম উদ্যোগে Indian League স্থাপিত হয়েছিল। এবারে বাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগলো।

কর্তৃপক্ষও সচেতন হলেন। প্রাচীন ইংরাজ প্রতিনিধিবৃন্দ যাঁরা উদারতা ও মহত্ত্বের মুখোস নিয়ে তখন ভারতবাসীকে সভ্যতার শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তাঁদের হৃদয়ে শঙ্কা প্রবেশ করলো। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত লিখলেন ঃ[১]

"Two generations ago we said we should wel-come this awakening. We urged India to it. We prepared for it. Now that it is come, we are afraid...........It has been an attitude of friendship first and of bitter opposition later."—এর

১. **The awakening of India— J. R. Mc Donald P 125**

চেয়ে স্পষ্ট সত্য আর নেই। ভারতবাসীর জাতীয় চেতনাকে রোধ করতে হবে, তার স্বাধীনতার কামনার কণ্ঠরোধ করতে হবে, নইলে আমেরিকার মত ভারতবর্ষও হাতছাড়া হয়ে যাবে। শাসক ইংরাজ কঠোর ও নিষ্ঠুর দমন নীতির সহায়তা গ্রহণ করলো। সর্বপ্রথম এ দেশবাসীর বাক্-স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা সরকার আরম্ভ করলেন। মাতৃমন্ত্রের বাণী যাতে দেশময় ছড়াতে না পারে, তার জন্যে Vernacular Press Act জারি হল। খবরের কাগজের মাধ্যমে এ ধরণের প্রচার বন্ধ করাই হল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে তারিণী শঙ্কর চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ[২] "১৮৭৬-৭৭ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গল এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ৩৫টি পত্রিকার মধ্যে ১৫টি পত্রিকার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয় যে এইগুলি রাজদ্রোহমূলক। সমাজ দর্পণ, সাধারণী, হিন্দু-হিতৈষিণী, সুলভ সমাচার প্রতিকার, বিশ্বদূত, ঢাকা প্রকাশ, ভারত মিহির, ভারত সংস্কারক ও সোমপ্রকাশের উপর সরকারী রোষ তীব্র হইয়া উঠে। সংবাদপত্রগুলির মুক্তিবার্তা প্রচার বৃথা যায় নাই।"

এই আইন জারির ফলে অমৃতবাজার পত্রিকা এক রাত্রি পরে প্রভাতেই ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। কারণ মুখ্যত আইনজারি হয়েছিল বাংলা সংবাদ-পত্রের উপরে।

কণ্ঠ রুদ্ধ হল। এবার শক্তি-ক্ষমতা কেড়ে নেবার পালা। পরের বছরেই অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে অস্ত্র আইনের ফলে ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করা হল। একান্তভাবে সরকারের প্রসাদভোগী ছাড়া অস্ত্র-শস্ত্র রাখার অধিকার থেকে সাধারণ ভারতবাসী বঞ্চিত হল। এ সময়ে বোম্বাই প্রদেশে কয়েকটি কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। স্বদেশী বস্ত্রের প্রতি আসক্তি ও হৃদয়ের অনুরাগের ফলে আহমদাবাদের মিলগুলি রাতারাতি বেড়ে উঠলো। বিলিতি কাপড়ের দাম কমে গেল অর্থাৎ লোকে কিনতে চাইলো না। চতুর ব্যবসায়ী ১৮৮৩ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে আগত 'আমদানী কাপড়ের ওপর থেকে শুল্ক তুলে নিলো। উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতায় যেন বোম্বের মিলগুলি টিকতে না পারে।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা বাংলা দেশের লোকের মনে নতুন করে ইংরাজ বিদ্বেষ জাগিয়ে তুললো। আমরা আগেই জেনেছি যে সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র ও বিহারীলাল এক সঙ্গেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এ দেশে এসেছিলেন

২. বিপ্লবী বাংলা—তারিণী শঙ্কর চক্রবর্তী পৃঃ ৭৭

সুরেন্দ্রনাথের কর্মচ্যুতির সংবাদও আমরা পেয়েছি। বিহারীলাল এই সময়ে কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট্ হলেন এবং সেই পদাধিকার বলে Justice of the peace হলেন। এবারে তিনি শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীদের বিচারের ভার পেলেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট থাকায় এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এ পার্থক্য ধরা পড়লো। তিনি ছোট লাট স্যার এ্যাস্লিকে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ ও আবেদন করলেন। এর পূর্বে ভারতীয়েরা শ্বেতাঙ্গদের বিচার করতে পারতেন না। বিচারকদের সম অধিকার দান করবার জন্য মহামতি ইলবার্ট ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে এই বিলের খসরা প্রস্তুত করেন। সমগ্র শ্বেতাঙ্গ-সমাজ এর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ব্যারিস্টার ব্রান্সনের নেতৃত্বে কোটপেণ্টধারী দেশীয় খ্রীস্টান পর্যন্ত এক হল। গভর্ণর থেকে আরম্ভ করে এ দেশের আপামর জনসাধারণকে পর্যন্ত তারা ধিক্কার দিতে লাগলো। ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র যেন নতুন জীবন পেলো। উভয় পক্ষই যুক্তি তর্ক দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে মুখর হয়ে উঠলো। হেমচন্দ্র ব্যঙ্গ কবিতা লিখলেন ঃ

"গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশ ম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রান্সন্ কেসায়ক মিলার।
নেটিভের কাছে খাড়া নেভার নেভার,
নেটিভ্. সে অপমান — হতমান বিবিজান।
নেটিভে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা,
বিবিজান দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না।"

এ আন্দোলনকে জাগিয়ে তুলবার জন্যেই যেন কলিকাতায় আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো। বিচারপতি নারিস সাহেব কোন একটি জটিল মোকর্দমার বিচার কল্পে কলিকাতার এক ধনী গৃহের বিগ্রহকে কোর্টে উপস্থিত করতে বললেন। হিন্দু সমাজ শিউরে উঠলো। গৃহ-দেবতা আদালতে এলেন, বিগ্রহ যবন স্পর্শ করলো। ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ!! সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত বেঙ্গলী কাগজে এর তীব্র প্রতিবাদ বেরুলো। সুরেন্দ্রনাথ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কলিকাতার ছাত্র সমাজে বিক্ষোভ দেখা গেল। সুরেন্দ্র নাথের বিচার উপলক্ষে যে ছাত্র-সমাজ আদালতের সামনে তাঁর জয়ধ্বনি করলো, আগামী ভারতের মুক্তিনেতা চিত্তরঞ্জন দাস ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেদিন সে জনতার সংখ্যা বাড়িয়ে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের আদর্শে সম্ভবত তাঁরাও সেদিন নিজেদের জীবনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দিষ্ট ক'রলেন।

এ জাগরণ ও আন্দোলনের ঢেউ পূর্ববঙ্গেও পৌঁছল। 'ঢাকা প্রকাশ' জাতীয়-চেতনা-উদ্বোধনে প্রেরণা দিতে আরম্ভ করলো। ইলবার্ট বিল সম্পর্কে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ[১]

'শ্বেতাঙ্গ ব্যারিস্টারগণের যমস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী লাল মোহন ঘোষ ব্যারিস্টার মহাশয় ঢাকার নর্থব্রুক হলে এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দেন যে, সমগ্র বাংলা ব্রান্‌সন প্রভৃতির প্রতি অজস্র ধিক্কার বর্ষণ করিতে লাগিল।"

॥ ৪ ॥

১৮৬৭ সালে কলিকাতায় যে হিন্দু মেলা আহূত হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সেই উদ্যোক্তাদের ভেতর একজন। ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে দেশ ও জাতির প্রতি প্রেম পূর্বেই উন্মেষিত হয়েছিল। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করলো। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং আত্মসচেতন নাট্যকার-মানস নাটকীয় পাত্রপাত্রীর মুখ থেকে সংলাপে ও সঙ্গীতে জাতীয়তাবাদ প্রচারে ব্রতী হলেন। দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের রচিত প্রথম নাটকের নাম "পুরুবিক্রম নাটক।" জাতীয় বীরের চরিত্রের মাধ্যমে শুধু বীর পূজাই নয়, অন্তরে বীরত্বের বীজ রোপণ করাও ছিল সে দিনের নাট্যকারের মনের কথা। এ প্রসঙ্গে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ[১]

"কলিকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির চেষ্টায় অনুষ্ঠিত এবং রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন বসু এবং নব গোপাল মিত্রের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলায় স্বদেশী ও জাতীয়তামূলক ভাবের প্রথম সূচনা। জাতীয়তামূলক বঙ্গদর্শনও এই নাটক রচনার পূর্বে প্রকাশিত হয়। এই পটভূমিকায় নাটকখানির আলোচনা করিলে ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।"

ঐতিহাসিকের উক্তি যে কতদূর সত্য তার বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। স্বয়ং নাট্যকার তাঁর জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন—হিন্দু-মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের লোকের প্রতি অনুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা

১. বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ১১২

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।" সুতরাং নাট্যকারের নাটক রচনার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েই প্রকাশিত হল।

দেশপ্রেমের আদর্শ বুকে নিয়ে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কাহিনীকে অবলম্বন করে তিনি নাটক রচনার সূত্রপাত করলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের বীরত্ব ও মহিমা প্রকাশ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁকে বাধা প্রদানকারী পঞ্চনদের রাজন্যমণ্ডলী এবং তাঁদের নেতা বীরশ্রেষ্ঠ পুরুর বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় বীরের বীর্য ও অখণ্ড ভারত প্রীতির মাহাত্ম্যই তিনি পুরুর মুখ থেকে প্রচার করলেন।

পঞ্চসন্ধি সমন্বিত এই নাটকখানি মহৎ উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও নাট্যকারের সৃষ্টি প্রাণবন্ত ও সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। এর প্রধান কারণ যুগমানস। রোমান্টিক আদর্শে এ যুগের সাহিত্যিক গোষ্ঠির দৃষ্টি ছিল আচ্ছন্ন। মহৎ আদর্শ প্রচারই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র সৃষ্টি বা নাটকীয় শিল্পকলা রক্ষা ছিল তাঁদের কাছে একান্ত ভাবেই গৌণ। তাই বাস্তব জীবন—যা নাট্যকারের মুখ্য সম্পদ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই ঐশ্বর্য বা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই সৃষ্টি-কৌশলের অভাবই নাট্যকার মানসকে শ্রেষ্ঠ ও সার্থক নাট্যকারের গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। তাঁর আদর্শবাদ তাঁকে রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টির পথে চালিত করেছে, তাই বস্তুবাদ বা মানব জীবনের প্রত্যক্ষ সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, ব্যথা-বেদনা তাঁর নাটকে রূপ অথবা প্রাণ পেলো না। অন্যপক্ষে আবার রোমন্টিক রচনার পূর্ণ স্বাধীনতাও তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা তাঁর নাট্য-সৃষ্টির প্রতি পদক্ষেপ শৃঙ্খলিত করলো। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও 'পুরু বিক্রম' নাটককে এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে এ নাটকে বীর রস আছে, কিন্তু প্রাণরস নেই।

দেশপ্রেমের অনুভূতি জনগণের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলবার জন্যেই পুরু চরিত্রের সৃষ্টি। সংস্কৃত নাট্যসূত্র অনুযায়ী অবশ্য পুরু 'ধীরোদাত্ত' গুন-বিশিষ্ট নায়ক, কিন্তু প্রাণহীন এবং দ্বন্দ্বহীন। একমাত্র বীরত্ব ব্যঞ্জক সংলাপ ছাড়া পুরু চরিত্রের কোনও দিকই বিকাশ লাভ করেনি। অবশ্য এ যুগে বাংলা দেশে কয়েকজন বড় বড় বক্তা জন্মগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের মত বাংলার বার্ক সেদিন স্বদেশপ্রেম প্রচারে শতমুখ হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত নাট্যকার-মানস তাঁদের বক্তৃতা দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তক্ষশীলার সঙ্গে পুরুর সংলাপে পাই : "তখন তো

তিনি পূর্বাঞ্চলের আর সমস্ত রাজাকে মেষের ন্যায় বশীভূত করতে পারবেন। কিন্তু এ কি ভ্রম! বীরপ্রসূ ভারতভূমিকে এখনও তিনি চেনেন নি।——যশোমান পৌরুষের বিনিময়ে যদি আমাদের শূন্য সিংহাসন আর এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে ধিক্ সে সিংহাসনকে, ধিক্ সে প্রাণকে আর ধিক্ সেই কাপুরুষকে যে এরূপ প্রভাবে কর্ণপাত করে।" [১ম অঃ ২য় গঃ]

দেশ প্রেমের স্বপ্নে তিনি আত্মহারা, দেশ তাঁর জননী-স্বরূপিণী, তার সম্মান ও গৌরব রক্ষার্থে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন করাই তাঁর ধর্ম। তাই ঐলবিলার প্রেম তাঁকে আকৃষ্ট করতে অক্ষম। তক্ষশীলার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ঐলবিলা তাঁকে জানালেন, কিন্তু প্রণয়িনীর প্রেম থেকে বঞ্চিত হওয়াও তাঁর পক্ষে সহজ, কারণ বিনিময়ে দেশের জন্য আত্মবিসর্জনের সুযোগ অনেক বেশী গৌরবের। পুরুরাজ বলেছেন: "সে নরাধম আপনার প্রেম হতে আমাকে বঞ্চিত করলেও স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য সংগ্রামে প্রাণ দিতে সে আমাকে কিছুতেই নিবারণ কত্তে পারবে না।" [১ম অঃ ২য় গঃ] আপন ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত হয়ে গ্রীকরাজ-দূতকে বলেছেন: "দূতরাজ, লোককে কষ্ট হতে মুক্ত করবার জন্যই ক্ষত্রিয় নামের সৃষ্টি। সেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় রক্ত বিন্দুমাত্র বহমান থাকতে কখনই অত্যাচারীর অত্যাচার সমস্ত পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারবে না। সূর্য নিস্তেজ হতে পারে, অগ্নিও চন্দনের ন্যায় শীতল স্পর্শ হতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় তেজ কিছুতেই নিভিবার নয়। যতদিন ক্ষত্রিয় নাম জগতে থাকবে, ততদিনই ইহাদের সেই তেজোময় পতাকা অত্যাচারীর পাপ মস্তকে উন্নত থাকবে।" [১ম অঃ ২য় গঃ]

গদ্যে, পদ্যে রচিত পুরুরাজের সংলাপে ভারতবাসীর আত্মসম্মানবোধ, জাতীয় চেতনা ও জাতীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার বাণী প্রচারিত হয়েছে। এমন প্রচারধর্মী নাটকীয় চরিত্র জীবনস্পর্শ বঞ্চিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মহারাজ পুরু নাটকের নায়করূপেও ঐতিহাসিক বীর হয়ে রইলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনীতে সুখদুঃখ-পূর্ণ মানুষের রূপ পরিগ্রহ করতে পারলেন না। দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে তাই মঞ্চে এ নাটক সার্থকতালাভ করতে পারে না, কারণ দর্শকমণ্ডলী মঞ্চের নরনারীকে একান্ত পরিচিত পরিবেশের অধিবাসী রূপেই দেখতে চায়। পুরুরাজ বহুদূরের লোক, তাই বীররূপে পূজা পেলেন, হৃদয়ের আতিথ্য পেলেন না।

ঐলবিলার মাধ্যমেও নাট্যকার বীর-ভারত-ললনার রূপ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রমীলা বা জনার মত ঐলবিলা জীবনধর্মে প্রাণবান নয়। তার চরিত্রে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি, তাই এ চরিত্র সৃষ্টিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আদর্শবাদী নাট্যকার যে সর্বজনীন একাত্মবোধ ও জাতীয় গৌরব প্রচার করতে চেয়েছেন, তা তাঁর নাটকে ছন্দবন্ধে ও সঙ্গীতে কিছু পরিমাণে সার্থকতা লাভ করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাই তাঁর জাতীয় সঙ্গীত রচনা মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকীয় ভাষার লালিত্য ও মাধুর্যের জন্য প্রশংসনীয়। নাটকের ভাষা তাঁর হাতে এক বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছে। একদিকে বিদ্যাসাগরী ও বঙ্কিমী ভাষার প্রভাব ও অন্যদিকে আলালী ভাষার প্রচলনই ছিল সে যুগের নাটকের ভাষা। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন করে এক মধ্য পথের স্রষ্টা। তিনি উভয় রীতি থেকে কিছু গ্রহণ কিছু বর্জন করে এক সুন্দর, মনোজ্ঞ অথচ প্রাঞ্জল নাটকীয় ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর রচিত ভাষা-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বঙ্কিম মহাসমাদরে মার্জিতরুচি নাট্যকারকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণের আশীর্বাদী নির্মাল্যরূপে জ্ঞানের ভাণ্ডার-দ্বার তাঁর সামনে উন্মুক্তই ছিল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় সুপণ্ডিত হয়েও তাঁর নাটকে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রলোভনকে জয় করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকে যে ভাষার রূপ দিলেন, পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল নাট্যকারেরাই সানন্দ চিত্তে একে নাটকের উপযুক্ত ভাষারূপে গ্রহণ করলেন। আজকের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে বুদ্ধির সূক্ষ্ম মানদণ্ডে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরু বিক্রমের' এ সমালোচনা করলেও সমসাময়িক বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে বিমুখ করেনি। ১৮৭৪ সালে গ্রেট্ ন্যাশনাল ও বেঙ্গল থিয়েটারে 'পুরু বিক্রম' নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। ১৮৭৪ সালে ক্যালকাটা রিভিউ (৫৯ খণ্ডে) এই অভিনয় সম্পর্কে লেখে :

"Plot is certainly very interisting and well drawn. The different phases of Rajput warrior and his queen Tuxila and Ambalika present very striking contrast to Porus and Ailabila, their weakness, their vacilation, their treachery set off very conspicuously the virtues of consistency and patrio-

tism in character of hero and heroine look at the language and spirit of the string words which Porus uses to infuse ambition into the heart of his soldiers arranged in the field.

"উঠ জাগ বীরগণ
দুর্দান্ত যবনগণ গৃহে দেখো করেছে প্রবেশ
হও সবে এক প্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ।
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।"

খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেতৃদের প্রচেষ্টায় এবং গণমানসের যুগোপযোগী ভাব গ্রহণেচ্ছু হৃদয়ে 'পুরু বিক্রম নাটক' পূর্ণ সফলতাই অর্জন করেছিল। জীবন্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখে বীরত্ব ব্যঞ্জক দেশপ্রেমের বাণী সেদিন বাঙ্গালীর অন্তর স্পর্শ করেছিল, নাট্যকারের চরিত্র সৃষ্টির দুর্বলতা প্রকাশের পথ পায়নি। সুতরাং সেকালে পুরু বিক্রম নাটক নাট্যরস পিপাসুদের যে আনন্দ দিতে সমর্থ হয়েছিল, 'ক্যালকাটা রিভিউ' এর সপ্রশংস উক্তি তারই সাক্ষ্য বহন করে। দেশাত্মবোধ জাগরণের প্রেরণায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক 'সরোজিনী নাটক' ১৮৭৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর প্রথম অভিনিত হয় নাট্যকার একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে রাজস্থানের কাহিনীর দ্বারস্থ হলেন। অবশ্য 'সরোজিনী' নাটক রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মধুসূদনের নিকট অনেকখানি ঋণী। 'সরোজিনী' ও 'কৃষ্ণকুমারীর' কাহিনীতেই যে শুধু সাদৃশ্য আছে তা নয়, চরিত্র সৃষ্টিতেও ঐক্য দেখা যায়। রাণা লক্ষ্মণ সিংহ ও ভীম সিংহ চরিত্র সৃষ্টি কৌশলের দিক থেকে বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে বলে হয় না। পরিণতির দিক থেকেও উভয়ের সাদৃশ্য অনেকখানি।

তবে এ কথা সত্য যে 'পুরু বিক্রমের' কার্য কৌশল থেকে 'সরোজিনী নাটক' উন্নততর সৃষ্টি, কারণ এ নাটকেও নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষিত না হলেও আদর্শবাদ অতখানি স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে উঠেনি। সেজন্যে প্রচার সাহিত্যরূপে খুব বেশী নাটকীয় সৌন্দর্য হানি ঘটে নি।

নায়ক লক্ষণ সিংহ বলবীর্যহীন পুতলি মাত্র। প্রাণহীন, পৌরুষহীন রাজপুত চরিত্র অঙ্কিত করে নাট্যকার তাকে জীবন ধর্ম ও প্রাণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষিতে রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের চরিত্রে বোধ হয়

এ প্রভাব কিছুটা কার্যকরী হয়েছে। নাট্যকারের মূল প্রচার উদ্দেশ্য রূপ পেয়েছে বীর বিজয়সিংহ চরিত্রে। লক্ষণসিংহের সঙ্গে সংলাপে বীর বিজয়সিংহ বলেছে ঃ "মহাশয় কেবল কথায় উৎসাহ প্রকাশ করলে কোনও কার্য হয় না। মাতৃভূমির প্রতি কার অধিক অনুরাগ যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি বলিদান দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করুন, কবে শুভগ্রহ উপস্থিত হবে তারই প্রতীক্ষা করুন, কিন্তু বিজয়সিংহ এ সকলের উপর নির্ভর করে না। এ সমস্ত গণনা করা ভীরু ব্রাহ্মণের কার্য, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। (লক্ষণসিংহের প্রতি) মহারাজ আমাকে অনুমতি দিন। আমি এখুনি যবনদের বিরুদ্ধে যাত্রা কচ্ছি। বিলম্বের কোনও প্রয়োজন নেই।

[১ম অঃ ২য় গঃ]

বিজয়সিংহ চরিত্রে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পুরুষকারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আর লক্ষণসিংহ নখদন্তহীন অদৃষ্টবাদী জড় মাংসপিণ্ড। শেষ পর্যন্ত বীর বিজয়সিংহ দেশ রক্ষার জন্য হাসি মুখে প্রণয়িনীর সামনে যবনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করলো। বিজয়সিংহ চরিত্রের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত, সমগ্র রাজপুত জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের মনোবল ও মানসিক দ্বন্দ্ব, সরোজিনীকে লাভ করবার জন্যে হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত তাঁকে সার্থক নাটকীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দান করেছে। পূর্ববর্তী নাটকের পুরুরাজ অপেক্ষা বিজয় সিংহ চরিত্র অধিকতর নাট্যগুণ বিশিষ্ট এবং বাস্তবধর্মী ও প্রাণধর্মে সমুজ্জ্বল।

নায়িকা চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। বন্দিনী যবনবালাকে পিশাচিনী-রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। সম্ভবত প্রচারধর্ম নাট্যকারের মনে একান্ত বলবতী থাকায় যবনবালা অতি রঞ্জিত রূপ পেয়েছে।

সরোজিনী নাটক সম্বন্ধে উপসংহারে এ মন্তব্য করা চলে যে আদর্শ প্রচার একান্ত ভাবে প্রকট না হ'লেও এবং চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার শেষরক্ষা করতে পারেন নি। এখানে স্বজাতীয় আদর্শ প্রচার অপেক্ষা বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্রেকই মুখ্য ভাবরূপ পেয়েছে। এই অপপ্রচারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে 'পুরুবিক্রম' অপেক্ষা সরোজিনী নাটক অপকৃষ্ট সৃষ্টি। 'পুরু বিক্রমের' যবন মুসলমান নয়, গ্রীক দেশবাসী। সুতরাং পুরুরাজের কাহিনী জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিন্তু

২৪—

সরোজিনী নাটক প্রকাশ্যে ইসলাম বিদ্বেষ প্রচার করলো। পরধর্ম অসহিষ্ণুতা সভ্যরুচি বিগর্হিত। এখানেই আবার পূর্বোক্তির পুনরুক্তি করে বলা যায় যে প্রচারধর্মী সৃষ্টি অতিরঞ্জন ও একদেশদর্শী হয়। এই উভয়বিধ দোষ ও ত্রুটি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। এখানে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মানুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পরাভূত ও হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৭৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটক প্রকাশিত হয়। সরোজিনী নাটকের মত এখানেও নাট্যকার মধুসূদনের পন্থানুসারী অর্থাৎ Tod's Rajasthan থেকে এ নাটকের কাহিনীও গৃহীত হয়েছে। রাজস্থানের কাহিনীতে নাট্যকারের নিজস্ব রোমান্টিক নাট্যাদর্শ আরোপ ক'রে 'অশ্রুমতীর' আত্মপ্রকাশে নাট্যকার সহায়তা করেছেন। নাটকের সূচনায় নাট্যকার তাঁর নাটকীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন ঃ

"There is not a pass in the Alpine Aravalli that is not Sanctified by some deed of Protap, some brilliant victory or often more glorious defeat. Haldighat is the Thermopoylee of Mewar, the field of Dewer her Marathan". অতীত ভারতের গৌরবময় বীরত্বগাথাকেই তিনি সেকালের ভারতবাসীর অন্তরে স্বাধীনতা লাভের কামনা ও আশা-আকাক্ষায় উদ্দীপ্ত করবার উদ্দেশ্যে প্রচারিত করেন। বীর প্রতাপসিংহের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ যাতে প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে দেশের জন্য আত্মানুভূতির বাসনা জাগরিত করে, তাই ছিল নাট্যকারের ঐকান্তিকী কামনা।

কিন্তু এই যে দেশাত্মবোধের নব জাগরণ, এ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীর পক্ষে প্রযোজ্য হ'ল না। স্পষ্টত বলতে গেলে, এ জাগরণকে হিন্দুধর্মের ও জাতীয় জীবনের পুনরুত্থান বলা চলে। কারণ হিন্দুমেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ প্রচার হলেও হিন্দুধর্মের শৌর্য বীর্যের পুনরুত্থানই এর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল। হিন্দুর মনে স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রেম জাগিয়ে তুলবার আশায় হিন্দু-মুসলমান সংগ্রামের প্রাচীন ইতিহাসকে বিষয়বস্তু স্বরূপ গ্রহণ করা হ'ল। ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এক দেশবাসীর মনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলা দূরে

থাকুক, আত্মবিদ্বেষ ঘনীভূত হয়ে এলো। বঙ্কিমের আনন্দমঠ, সীতারাম, রাজসিংহ ইত্যাদির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক গুলাও একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হ'ল। প্রতিক্রিয়া যে হয়নি তা নয়, 'বঙ্কিমদুহিতা'ও সেদিনের শিক্ষিত মুসলমানের কাছ থেকে জবাব স্বরূপ পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য একথা ঠিক যে ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রচার করে ভারতকে খণ্ড ছিন্ন করবার মত হীন অথবা দীন অন্তরের অধিকারী তাঁরা ছিলেন না এবং হিন্দু জাগৃতি সেদিন ভারতীয় জাগৃতি অর্থেই তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন। তবুও হিন্দু-মুসলিম সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত করে মুসলিমকে হেয় প্রতিপন্ন করায় যে তাঁদের শিল্পীসত্তা অবমানিত হয়েছিল, সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রকাশ্যে ইংরাজ রাজ-সরকারকে বিরুদ্ধ পক্ষ নির্বাচন করে দেশপ্রেম প্রচারের মত মনোবল বা হৃদয়বল সেদিনের অধিকাংশ বাঙ্গালীরই ছিলনা বলেই তাঁরা যবনকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই হৃদয় দৌর্বল্যের মূল্যও তাঁদের দিতে হল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তা পূর্ণ সার্থকতার গৌরব লাভে বঞ্চিত হল।

'অশ্রুমতী' নাটকে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারিত হয়েছে। অশ্রুমতীর শিক্ষাদান সম্পর্কে প্রতাপ বলেছেন—"মহিষি, তুমি ওদের ভাল করে শিখিও; যেসব গাথাতে রাজপুত বীরত্বের গুণকীর্তন ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ আছে, সেইসব গাথা ওর কণ্ঠস্থ করিয়ে দিও।" [২য় ১গঃ] প্রতাপের মুখে এ সংলাপ যোজনায় প্রতাপ চরিত্রকে তাঁর মহান গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রসঙ্গক্রমে ডঃ দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ[১]

"শরৎ ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর পর 'বেঙ্গল থিয়েটারে' তাঁহার সম্মান রজনী উপলক্ষে 'অশ্রুমতী' নাটক অভিনীত হয় এবং অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র প্রতাপ সিংহের ভূমিকায় নামেন। দুই এক অঙ্ক পরে তিনি চলিয়া যান। কিন্তু হঠাৎ এইরূপ চলিয়া যাওয়ার কারণ কেহ নির্ধারণ করিতে পারে না। কয়েকজন খুঁজিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে বলেন, 'আগে যদি ঘুণাক্ষরে জানতাম যে প্রতাপসিংহের কন্যা সেলিমের অনুরাগিণী তবে কি এ অভিনয়ে সম্মতি দিই"?

১. বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত—ডঃ হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ১২০

এর থেকে আমরা এ সত্যে উপনীত হই যে 'অশ্রুমতী' নাটকের কাহিনী পরিকল্পনা হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের ভাবানুভূতিকেও আঘাত করেছিল। ঐতিহাসিক নাট্যকারের দায়িত্বজ্ঞান যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন। কারণ ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা বজায় রাখাও যেমন কর্তব্য, তেমনি বহুকাল সিঞ্চিতবদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য জড়িত গণঅনুভূতিকে লঙ্ঘন করে তাদের অন্তরে আঘাত করবার অধিকার নাট্যকারের নেই। সুতরাং অশ্রুমতীর অবাস্তব আদর্শচ্যুত চরিত্র পরিকল্পনা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই জাতীয়তা ও ধর্মীয় বোধকে ক্ষুন্ন করেছে। প্রতাপের মুখ থেকে নাট্যকার দেশপ্রেম প্রচার করেছেন—" কি মানসিংহ তুমি, তুমি আমার অহঙ্কার চূর্ণ করবে। সর্বলোক পূজনীয় রামচন্দ্রের অকলঙ্কিত রক্ত যে ধমনীতে বহমান তার অহঙ্কার চূর্ণ করা কি দাসব্রতে রত পতিত মানভ্রষ্ট মানসিংহের কর্ম।" [১ম অঃ ১ম গঃ] অন্যত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ঝালাপতি মান্নাকে বলেছেন ঃ

"না ঝালা, ছত্র উন্নত থাক—আমি চাই যে এই চিহ্ন দেখে মানসিংহ আমার কাছে-আসে—যদি সে কাপুরুষ না হয়, অবশ্যই আসবে, চল, চল যেখানে মানসিংহ সেইখানে চল।" [১ম অঃ ৭ম গঃ]

এখানে প্রতাপ-চরিত্রে সমগ্র রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট্য আরোপ করে নাট্যকার শিল্পরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

নাটকের দ্বিতীয় চরিত্র সেলিম আদর্শ পুরুষ। সেলিম চরিত্রের ঔদার্য, মহত্ত্ব, বীরত্ব, প্রভৃতি গুণাবলী দেখে একথা স্পষ্টই বলা যায় যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হৃদয় সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ছিল।

নায়িকা অশ্রুমতী বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিকারূপে চিত্রিত হয়েছেন। হয়ত রাজপুত রমণীরা কিছুটা কঠোর, কঠিন এবং সহজ স্বচ্ছন্দ স্বভাবের অধিকারিণী ছিলেন, তবুও ভারতীয় নারীর রমণীয় কমণীয়তা ও লজ্জাশীলতা অশ্রুমতীকে স্পর্শ করতে পারেনি। অশ্রুমতী চরিত্র সৃষ্টিও তাই সর্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করে সার্থকতা লাভে অক্ষম হয়েছে।

পঞ্চসন্ধি সমন্বিত অশ্রুমতী নাটকে সংস্কৃতি রীতি অনুসারে নাট্যকার প্রয়োজন মত দৃশ্য যোজনা করেছেন। এই নাটকেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির কৌশল ও কাব্য রচনার পারদর্শিতা দেখা যায়।

অবশ্য কাহিনীগত আদর্শ প্রচারের ত্রুটি গ্রহণ না করলে, শিল্প কৌশলের দিক থেকে 'অশ্রুমতী' রসোত্তীর্ণ।

'অশ্রুমতী' নাটক রচনার পর বহুদিন পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর কোনও প্রচারধর্মী নাটক রচনা করেন নি। স্বয়ং নাট্যকারই তার কারণ উল্লেখ করেছেন ঃ[১]

"ইহার কিছুদিন পরে গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশঃ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্য সাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্য সেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম।" অবশ্য এ উক্তির কয়েক বৎসর পরে পুনরায় তিনি ঐ একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নাটক রচনা করেন। জাতীয় জাগরণের উদ্দেশ্য 'স্বপ্নময়ীর' রূপায়ন। এ জাতীয় নাটকগুলির মধ্যে 'স্বপ্নময়ী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যর্থতম সৃষ্টি। যে ঐতিহাসিক কাহিনীকে অবলম্বন করে এ নাটকখানি রচিত হয়েছে, তার বিষয়বস্তুর সত্যনিষ্ঠা থেকেও নাট্যকার বিচ্যুত হয়েছেন। তা ছাড়া, স্পষ্টতই এ নাটকে নাট্যকার পরধর্ম অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন।

অবশ্য উপসংহারে আমরা এ কথাই বলবো যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে গণমানস তাদের অন্তরক্ষুধা মিটাইবার মত ভাব সম্পদ পাবার জন্যে এ নাটকগুলি আংশিক সার্থকতা লাভ ও তৎকালীন সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের গৌরবময় স্মৃতি সেদিন ঘরে ঘরেই ছিল বরণীয় এবং পূজনীয়। কিন্তু কালের হাওয়া যখন কিছুটা পরিবর্তিত হ'ল, হৃদয়ের নিছক আবেগ প্রবণতা ছাড়াও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে যখন সাহিত্যরসিক এ নাটকগুলিকে বিচার করতে চাইলো, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, হৃদয় প্রশস্ত ও উদার ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু অতি-প্রচারকের হৃদয়ের ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস তাঁকে একদেশদর্শী ও অতি রঞ্জনের দোষে দোষী করেছিল।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় প্রাচ্য সংস্কৃতির নব জাগরণের ফলে শাসক সম্প্রদায় চিন্তিত হলেন। জনসাধারণের কাছে উচ্চ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করবার জন্যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়স বাইশ থেকে উনিশ করা হল। সচেতন

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—কবি বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১৫০—১৫১

দেশবাসী আন্দোলন উপস্থিত করলো। ফল ফললো। পুনরায় পরীক্ষার্থীর বয়স বাইশ বৎসরই নির্দিষ্ট করা হ'ল।

ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবন এমনি ভাবে নিপীড়িত হ'তে লাগলো। সুতরাং ঃ[১]

"Leading Indians now felt the need of a more comprehensive political organisation than any of the existing associations and accordingly the Indian association convened the First all India conference in Calcutta from 28th to 30th December 1883."

এমনি করে ধীরে ধীরে ১৮৮৫ সালে প্রথম ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ইউনিয়ান স্থাপিত হয়। এই সত্তাই পরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসে রূপান্তরিত হয়। সর্বপ্রথম বোম্বাই প্রদেশে এই সভার অধিবেশন হয়েছিল। উদ্যোগী হলেন এ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম নামে একজন ভূতপূর্ব রাজকর্মচারী। ইংরাজ কর্মচারী জড়িত আছেন ব'লে কর্তৃপক্ষ এ অধিবেশনে সহায়তা না করলেও অসহযোগ করেন নি। এ সভার সভাপতিত্ব করেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এ সভা দাবি জানালো, যে ভারতে আইনসভা স্থাপন করতে হবে। এদেশে ও ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিলাতী কাপড়ের ওপর পুনরায় শুল্ক ধার্য করতে হবে। মহারাণীর ভক্ত প্রজারা "Three times three cheers for Her Majesty the Queen" ব'লে সভাভঙ্গ করলেন। বিদেশী শাসক সেদিন একথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি যে অপরের জননীর জয়-ধ্বনির মধ্য দিয়েই আগামী দিনের ভারতে উচ্চারিত হবে 'বন্দে মাতরম্।' কিন্তু এ অধিবেশনে বাংলার সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন অনিমন্ত্রিত রইলেন। কারণ সরকার-বিরোধীরূপে তাঁরা পূর্বেই পরিচয়পত্র পেয়ে গেছেন।

১৮৭৬ সালে নাট্যজগতে 'অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ' আইন পাশ হয়ে গেল। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চাকরদর্পণ' নাটক উপলক্ষ্য করে এই আইন চালু হ'ল। নাটকে ইংরাজের জঘন্য অত্যাচার ও চা বাগানের সাহেবদের পাশবিক নীচতা ও নারী মাংস লোলুপতার কাহিনীই বর্ণিত হয়েছিল। অবশ্য

১ The British Impact on India - Sir Percival Griffiths, p 278

নাটকখানা কাহিনী ও আঙ্গিক দিক থেকে নীলদর্পণের ব্যর্থ অনুকরণ। উপলক্ষ 'চাকরদর্পণ' হলেও সরকারী রোষবহ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' 'শরৎ-সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রভৃতি নাটক উপলক্ষ করে। এ সম্পর্কে ডঃ দাশগুপ্ত বলেছেন ঃ[১]

"গভর্ণমেণ্ট অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করিবার পূর্বে এই নাটকখানি অজুহাত ধরেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ইহা অজুহাতমাত্র। ইহা অভিনীত হয় নাই। গজদানন্দ, হনুমান চরিত্র এবং পুলিশ অব্ পিগ্ এ্যাণ্ড শিপ্ প্রভৃতি প্রহসনের অভিনয়েই সরকার চটিয়া যায়। বিশেষতঃ পুরুবিক্রম, সরোজিনী, শরৎ-সরোজিনী প্রভৃতি উদ্দীপনাময় অথচ সুললিত নাটকের অভিনয়েই 'অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন' পাশ করিতে গভর্ণমেণ্ট বদ্ধ পরিকর হয়। এ প্রসঙ্গে যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ[২]

"১৮৭৬ সালে রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন হয়। রঙ্গমঞ্চ স্বাদেশিকতার ভাব প্রচার করছিল, তাই এই আইন। রসরাজ অমৃত বসু ও উপেন দাসের এক মাস ক'রে কারাদণ্ড হয়। অবশ্য হাইকোর্টে আপিলের ফলে তাঁরা ছাড়া পান।"

কিছু দিনের জন্য বাংলার রঙ্গমঞ্চ স্তিমিত হয়ে পড়লো। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির যেমন কপালকুণ্ডলা, সীতারাম প্রভৃতির নাটকীয় রূপ দান করে রঙ্গমঞ্চ ক্রিয়াশীল করে রাখলেন।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে মণিপুর বিদ্রোহ হয়। টিকেন্দ্রজিৎ ফাঁসীর মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করলেন। সমগ্র ভারতবাসী রুদ্ধ আক্রোশ ও দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ে আবদ্ধ ক'রে সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় রইল। এ সময়ে বাংলার কর্ম জগতে আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা—বাংলার সন্তান বিবেকানন্দ চিকাগো কন্‌ফারেন্সে হিন্দু ধর্মের বিজয় গৌরব ঘোষণা করে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন। জাতীয় জাগরণের দীক্ষায় রক্ত-তিলকে ললাট রঞ্জিত করে শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় ফিরে এলেন।

বাংলার আপামর জনসাধারণের সঙ্গে মারাঠারাও হাত মিলালো, কিন্তু তাদের কর্মচেতনা ভিন্ন গতি ও পথ অনুসরণ করলো। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে পুনায় 'গণপতি' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে লোকমান্য তিলক 'শিবাজী-উৎসবের' অনুষ্ঠান করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র কাব্যে যে আহ্বান আমরা পেয়েছি—

১. বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ১৪৩

২. বিপ্লবী জীবনে স্মৃতি যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৯

'মারাঠার সঙ্গে আজি হে বাঙ্গালী
এক কণ্ঠে বলো,
জয়তু শিবাজী" [শিবাজী উৎসব]

রাণাপ্রতাপ ও শিবাজীর মাতৃমন্ত্রে তিলক সকলকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানালেন। দেশের নানা জায়গায় বিপ্লবীদল গঠিত হতে শুরু করলো। ১৮৯৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসবের দিন র‍্যাণ্ড ও আগষ্ট নিহত হলেন। হত্যাকারী চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় দামোদর ও বালকৃষ্ণ ফাঁসীর মঞ্চে শুনিয়ে গেলেন জীবনের জয়গান। তিলকের প্রভাব বাংলা দেশেও অনুভূত হল। ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ[১]

"The emotional Bengalee soon began to regard Tilak as a national hero and even Surendranath Banerjee whose approach to politics was fundamentally different from that of Tilak, deeply deplored the chitparan's imprisonment 'For Mr. Tilak,' he said, 'my heart is full of sympathy, my feelings go forth to him in his prison house."

কিন্তু তিলোকের আন্দোলনের ফলে পরোক্ষে একটি সর্বনাশা কুফল দেখা দিল। হিন্দু জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হলেও মুসলিম অসন্তোষ বহ্নি প্রজ্জলিত হয়ে উঠলো। কারণ ভারতের মুক্তি আন্দোলনে শুধু হিন্দুরই অধিকার, হিন্দু আদর্শেই এ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে সর্ব ধর্মীয় ভারতবাসী এ কথা হৃষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারলেন না। বৈদেশিক সূক্ষ্মদর্শী বলেছেন ঃ[২]

"The immediate occassion of this anti-Muslim propaganda was the govt. order forbidding Hindu processions to play music in front of Muhammadan mosques but its more permanent support came from an "anti-cow-killing society' established by Tilak as part of his programme of India for the Hindus."

অবশ্য কংগ্রেসের নীতি যে ন্যায় পথে চলছিল না, এ অভিযোগ আরও অনেকের মুখ থেকেও শোনা গিয়েছিল। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন ঃ[৩]

১. The British Impact on India-Sir Percival Griffiths P 287
২. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, P. 286
৩. শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ—শ্রী গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী পৃঃ ৬৬

"কংগ্রেস জাতীয় আখ্যা পাইতে পারে না। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা যে বলে ইহাতে মুসলমান নাই বলিয়া জাতীয় নয়—সে কথা ঠিক নয়। কেন না যথেষ্ট মুসলমান প্রতিনিধি আছে এবং কংগ্রেস মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ ও দাবী সম্পর্কে অতিশয় বেশী সচেতন। কংগ্রেস জাতীয় নয় এই বলিয়া যে ইহাতে ভারতের জনসাধারণ বা তাহাদের প্রতিনিধি নাই। ইহাতে শুধু আছে ইংরাজ আমলের ভুঁইফোঁড় উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, খবরের কাগজের সম্পাদক, চাকুরীজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী এক শ্রেণীর বণিক সম্প্রদায়। আর আছে কিছুটা জমিদার ও সঙ্গতিসম্পন্ন রায়ত। ইহারা কেহই জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়।"

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেতর যে অসন্তোষের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে লাগলো, কালক্রমে তাই বিরাট মহীরুহের ব্যবধান সৃষ্টি করলো।

এই সমস্ত অসন্তোষ-বহ্নির মাঝে আত্মপ্রকাশ করলো উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক। সেকালের সমাজের ইংরাজ বিদ্বেষ ও মৃতপ্রায় ভারতবাসী যে ধীরে ধীরে নিজেদের দীনহীন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, এ নাটকে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। নাটক রচনার উদ্দেশ্য নাট্যকার গোপন রাখেন নি। তাঁর সৃষ্ট পাত্রপাত্রীদের মুখ থেকেই তা ব্যক্ত হয়েছে :

"নন্দ। নাটকে প্রণয়ের মূর্তি যে এত অধিক অঙ্কিত দেখতে পাওয়া যায় তার নিগূঢ় কারণ আছে। আপনার স্মরণ রাখা কর্তব্য প্রণয় আমাদের সর্বপ্রধান মনোবৃত্তি।

শরৎ। পশুদের হতে পারে, মানুষের নয়—অন্তত হওয়া উচিত নয়। আর তাই যেন হ'ল, প্রণয়ে মত্ত হবার কি এই সময়? আমাদের ঘৃণা নাই? গরু গাধার মত দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তাকি মনে থাকে না? পদে পদে ইংরাজের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হয় না? মনে ধিক্কার জন্মায় না? এখন অন্য ইচ্ছা? অন্য অভিলাষ?

নন্দ। তবে বন্দুক ধরুন না কেন?

শরৎ। এখন সময় হয়নি।

নন্দ। শীঘ্র হবে?

শরৎ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত) আমরা যে হতভাগা কাপুরুষের জাত। একশ-দুশো বৎসরের মধ্যে যে হবে, এমন আশাও মনে স্থান পায় না। কিন্তু যতদিন না ভারতে স্বাধীনতা-সূর্য পুনরুদয় হয়, যতদিন না অত্যাচারীর লোহিত মুণ্ড আমরা

পদতলে লুণ্ঠিত-দলিত করতে পারি, ততদিন যে প্রণয় কি অন্য কোনও পশুবৃত্তির অনুসরণ করবে, সে কৃতঘ্ন, পামর, নরাধম, দেশের কুসন্তান।" [১ম অঃ ১ম গঃ] বাংলার বুকে যে বিপ্লবী দলের জন্ম হয়, অরবিন্দ, বারীন যে ইংরাজ বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত করে, 'শরৎ-সরোজিনী' তারই একটি ক্ষুদ্র, জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ। নাটকের পাত্র বেচারাম বলেছে—'মশাই এক বেটা গোরা মাতাল হয়ে যাকে তাকে মাচ্ছে। একজন গেরস্তদের বাড়ী ঢুকে তাদের ওপর এমনি উৎপাত কচ্ছে—

শরৎ। বিশুদ্ধ ইংরাজ চরিত্রের কীর্তি স্তম্ভ। ইংরাজী সুশাসনের উড্ডীয়মান জয় পতাকা। [৩য় অঃ ৩য় গঃ]

উপেন্দ্রনাথের পূর্বে দীনবন্ধু ও মীর মোশারফ হোসেন ছাড়া এমন জ্বালাময়ী ভাষায় নাটকে আর কোনও ব্যক্তি ইংরাজ চরিত্রের এরূপ সমালোচনা করেন নি।

পরাধীন ভারতবাসীর অন্তরের মর্মান্তিক জ্বালা নাট্যকার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকের পরিণতির কালে নায়ক বলেছে ঃ

"জগৎ দেখুক, বাঙ্গালীদের কাপুরুষ অপবাদ সত্য কি মিথ্যা (ভীষণ বেগে উভয়কে অসিহস্তে আক্রমণ) আমি মরি, কিন্তু স্বর্গ সাক্ষী বাঙ্গালী কাপুরুষ নয়।"
[৪র্থ অঃ ৫ম গঃ]

শুধু যে বাঙ্গালী যুবকের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলবার জন্যেই নাট্যকার লেখনী ধারণ করেছিলেন, তা নয়। বাঙ্গালী মেয়েকেও যে সব রকমে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে হবে, এ প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেছিলেন। সরোজিনী চরিত্রের সহায়তায় নাট্যকার আদর্শ বাঙ্গালী মেয়েকে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। সরোজিনী উচ্চশিক্ষিতা, কিন্তু উগ্রস্বভাবা নয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েদের সম্পর্কে সমাজ তখন খুব বেশী সহানুভূতিশীল ছিল না, কারণ সেকালের লোকের ধারণা ছিল মেয়েরা লেখা-পড়া শিখলে উগ্রস্বভাব ও পুরুষের মত হয়, তাদের সহজাত কোমল বৃত্তির বিকাশ ঘটে না, বরং তা লুপ্ত হয়ে যায়। সরোজিনী এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ।

ঘটনাবৈচিত্র্যই এ নাটকের প্রাণ, চরিত্র সৃষ্টির বিশেষ কোনও নৈপুণ্য বা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। সরোজিনীর পুরুষবেশ ধারণ সেক্‌স্‌পীয়রের Merchant of Venice ও As you like it এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এ নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন ঃ[১]

"রোমাঞ্চকর ঘটনার বাহুল্য এবং বৈচিত্র্যই 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের প্রাণ, সুতরাং এ ষষ্ঠাঙ্ক নাটকখানিতে চরিত্র বিকাশের কোনও অবকাশ নাই। চরিত্র

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—(২য় খঃ) ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৩১৬।

চিত্রণেও কোনও রকম নৈপুণ্য বা বৈশিষ্ট্য নাই। তবে ইহার অভিনয় খুব বেশী জমিয়াছিল এবং স্বাদেশিকতার জন্য শিক্ষিত পাঠকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। যে সময়ে নাটকখানি রচিত হইয়াছিল, তখনকার দিনের স্বদেশপ্রিয় শিক্ষিত যুবকদের মনোভাবের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইতেছে।"

রচনা রীতি প্রাঞ্জল হলেও সংগীত রচনায় নাট্যকারের পারদর্শিতার অভাব দেখা যায়।

সেকালের সমাজে 'শরৎ-সরোজিনী' যে সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিল সংবাদ পত্রে তার নমুনা পাওয়া যায় ঃ[১]

"উৎকৃষ্ট পদার্থ নাটকে কতকগুলি বাংলা নাটক-লেখক মাটি করিয়া তুলিতেছেন। তাহাদের হইতে নাটকের যে দুর্নাম রটিয়াছে, উপেন্দ্রনাথ দাস হইতে তাহা দূর করিবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহার শরৎ-সরোজিনী বিদ্বজ্জন সমাজে সমধিক সম্মানলাভ করিয়াছে। ... ... উপেন্দ্রনাথের প্রণীত নাটকের একটি বিশেষ গুণ আছে। এই সব গ্রন্থে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হাস্যাদি রসের সমাবেশ করিয়া পাঠকদিগকে বিশুদ্ধ আনন্দরসে আনন্দিত করা তাঁহার নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। তিনি নাটক রচনায় অনেকগুলি অভিপ্রেত বিষয়ে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা সতীত্বের সমধিক গৌরব করিয়া থাকেন। বিনোদিনী ও বিরাজমোহিনীর ব্যবহার ও কর্মদ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইংরাজীতে সুশিক্ষিত নাট্যদল যে সমধিক সাহসী ও অনেক অংশে কাজের লোক হইতেছিল, তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে উপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' একই উদ্দেশ্যে রচিত হয়। নাটক রচনার উদ্দেশ্য নাট্যকার সুকৌশলে সঙ্গীতের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল,
সোনার ভারত আহা, ঘোর বিষাদে ডুবিল
শোক-সাগরেতে ভাসি
ভারত মা দিবানিশি
স্মরি পূর্ব যশোরাশি
কান্দিতেছে অবিরল
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল।"

১. সোম প্রকাশ ৮ই ভাদ্র ১২৮২ সাল, পৃঃ ৬৪৭।

জননীর অশ্রুজল মোচনের জন্যেই নাট্যকারের মঞ্চের সহায়তা গ্রহণ। ইংরাজের অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য নাট্যকার ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন। ম্যাক্রেণ্ডেল নামে এক নীচাশয় ইংরাজের কলঙ্ক-কালিমাময় চরিত্র এ নাটকে রূপ পেয়েছে। সাহেব প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তখনকার দিনের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় প্রায়ই এখানকার বাদশাহী চালচলন বজায় রাখবার জন্যে ঋণে জর্জরিত থাকতেন। অবশ্য উত্তমর্ণ দেশী নেটিভ্। তাই টাকা ফিরিয়ে দেবার খুব বেশী জরুরি তাগিদ থাকতো না। কোনও মতে গা ঢাকা দিয়ে সাগর পাড়ি দিতে পারলে আর অসুবিধা কিসের? ম্যাক্রেণ্ডেল ঐ জাতীয় ইংরাজ। তাই টাকা ধার নিয়ে হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়ে ফেলে বলেছে—"আমি যে তোমার টাকা স্পর্শ করেছিলাম এই তোমার পরম সৌভাগ্য। তুমি আবার প্রত্যর্পণ প্রত্যাশা কর"। [১ম অঃ ৪ গঃ]

এই যে দেশবাসীকে কৃতার্থ করবার মনোবৃত্তিতে এদের শোষণ করা এবং ঘৃণ্য হীনদৃষ্টিতে দেখা এর প্রতিবাদ শুনতে পাই ইংরাজের কাছ থেকে আঘাতপ্রাপ্ত নায়ক সুরেন্দ্রের মুখে: "কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, নরাধম বাম স্কন্ধের এক মাংস পেশীতে মাত্র আঘাত লেগেছিল তাই রক্ষা পেয়েছি। পাপিষ্ঠ নারকী আমার জীবন নাশ করতে কৃতসংকল্প হয়েছিল (নতজানু হইয়া মুষ্টিবদ্ধ ভাবে) স্বর্গ-সাক্ষী যদি জীবিত থাকি, পূর্ণ মাত্রায় এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।" [২য় অঃ ২য় গঃ]

কৃষ্ণবর্ণের প্রতি শ্বেতকায়ের অত্যাচারের প্রতিবিধানের কথা সেদিনের ইণ্ডিয়ান পেনাল্ কোডে ছিল না। থাকলেও তা কাগজেকলমেই পর্যবসিত ছিল। বিজেতার জন্য বিজিতের প্রতি অত্যাচার কোনও দিনই দণ্ডনীয় হয় না, কারণ কোন্ বিচারালয় বা আদালত কার্ তৈরী আইনের বলে তাকে শাস্তি দেবে, ও ইংরাজের অধীন ভারতবর্ষে যত অন্যায়, যত অপরাধই প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছিল সবই শাসিতের, তাই সুরেন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছে:

"বিচারালয় যে থেকেও নেই? আত্মসমর্থন করতে আমাদের সকলেরই সমান অধিকার আছে, এবং করাও একটি প্রধান কর্ম। আত্মরক্ষা প্রভৃতির প্রথম অনুশাসন কিন্তু সভ্যতাবিস্তারের সহিত সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যেই সেই স্বত্ব ও অধিকার কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধি স্থলে অভিষিক্ত হয়ে সত্য বিচার করবেন এই শপথপূর্বক সেই গুরুতর কর্মের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহারাই যখন অত্যাচারী, উৎপীড়ক

ও স্বার্থপরায়ণ হয়ে ওঠেন, তখন ধর্মাসন সকল পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়। যখন শুক্ল কৃষ্ণবর্ণের তারতম্য অনুসারে বিচার ফলেরও তারতম্য হতে আরম্ভ করে, তখন অজাত-শত্রু, ইন্দ্রিয়সুখান্বেষী লম্পট বিদেশীয় বালকদের উপর সহস্র সহস্র লোকের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা ও নষ্ট করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিক্ষিপ্ত হয়—তখন আমাদের সেই আদিম স্বত্ব আমাদের হাতে প্রত্যর্পণ করে, তখন উপেক্ষা করে থাকা মূর্খতা, ভীরুতা অমানুষিকতার কর্ম—তখন তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলে ঘোর প্রত্যবায় আছে।"

[২য় অঃ ৪ গঃ]

মুখ্যত দেশপ্রেম প্রচার যদিও নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল এবং প্রচারকার্যে তার পূর্ণ সার্থক প্রচেষ্টাই দেখা যায়, তবুও নাটক রচনার আঙ্গিক ও শিল্পকুশলতার অনেক ত্রুটিই চোখে পড়ে। উভয় নাটকের প্রচারবিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় নাটকের পাত্র পাত্রীও একই ছাঁচে ঢালা ও তাদের সংলাপে পর্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে ঐ ধরণের সংলাপ শুনবার জন্যে সেকালের দর্শকের চিত্ত উন্মুখ হয়ে ছিল, তাই বার বার শুনবার পরও অতৃপ্তি বা এক ঘেয়েমির অবসাদ তাদের আসেনি। শরৎ ও সুরেন্দ্র, সরোজিনী ও বিনোদিনী এমন কি বিরজা ও সুকুমারী একই কাঠামোতে ভিন্ন বস্তুর প্রলেপ।

অত্যাচারী ম্যাক্রেণ্ডেল ও বিনোদিনীর প্রতি তার অত্যাচার নীলদর্পণের রোগ সাহেব ও ক্ষেত্রমণির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চরিত্র সৃষ্টি নীরস। ঘটনার বাহুল্য এবং ইংরাজ চরিত্রের কলঙ্কের উপর বাঙ্গালী চরিত্রের সহনীয়তা দেখিয়ে নাট্যকারগণ চিত্ত জয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। বাঙ্গালী যুবকের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ জাগানই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। শিল্পী উপেন্দ্রনাথ পরাজিত হয়েছেন আদর্শ দেশপ্রেমিক উপেন্দ্রনাথের কাছে।

অবশ্য প্রকাশ্যে নিজের নামে এ নাটক প্রকাশ ও প্রচার ক'রবার শক্তি নাট্যকারের ছিল না। 'দুর্গাদাস' এই ছদ্মনামে উপেন্দ্রনাথ এ নাটক প্রকাশ করেন। তিনি আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্রবাবু ও ম্যানেজার অমৃত বসুর এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। আপীলে বিচারপতি 'ফিয়ার' ও 'মার্কবী'র রায়ে তাঁরা মুক্তি পেলেন।

'থিয়েটার নিয়ন্ত্রণ আইন' পাশ এবং এই দুই মঞ্চজগতের কর্মচারীর কারাদণ্ডের ফলে দেশের লোক এ কথাই জানলো, যে তারা নিজেদের দাবী দাওয়া সম্পর্কেই শুধু সচেতন হয়নি, ইংরাজ শাসন কর্তারাও সশঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

॥ ৫ ॥

১৮৯০ সালে সরকারী অসহযোগ নীতি গৃহীত হল। কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র 'মহাপূজা' নাটকের অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে প্রীত ও অপ্যায়িত করলেন। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য যে নাটক রচনা করেন—'সিরাজুদ্দৌলা' ও 'মীর কাশিমে' যে সার্থকতা তিনি অর্জন করেছিলেন, মহাপূজায় তার সূত্রপাত। শিল্পমেলার মাধ্যমে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন সূচিত হয়, এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। গিরিশও স্বদেশের উন্নতির জন্যে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন। মহাপূজায় এ ভাবেরই অভিব্যক্তি। জাতীয় কংগ্রেস যেমন বৃটিশের কাছে তখন ক্রমাগত নিজেদের দাবী-দাওয়া পেশ করছিলেন, গিরিশও তেমনি বৃটেনিয়ার কাছে প্রার্থী ঃ

"বৃটেনিয়া— বল সতি কি কারণে ভারত সন্তানগণে
এতদিন শিল্পবিদ্যা করনি প্রদান
চিরদিন শিল্প জান উন্নতি সোপান।"

সরস্বতীকে আহ্বান ক'রে বলেছেন ঃ

"অনুমতি মম প্রতি, কর নাই ভাগ্যবতী
রাজোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায়।
ছিল শিল্প নানামত শ্বেত-শিল্প-তেজে হত,
নিরুৎসাহে শিল্প-কার্য না করে গ্রহণ,
ভারত সন্তানে দেহ আশ্বাস বচন!

ভারতের এ দিন ছিল না। শিল্প-বানিজ্যে ভারতও একদিন উন্নত ছিল। তাই পূর্বঐশ্বর্য স্মরণ ক'রে নাট্যকার বলেছেন ঃ

"চিকণ বসনতরে রোম আসি তব ঘরে
জানাইত জন্মদে, তোমায় প্রয়োজন

কালোপযোগী ভাবের অভিব্যক্তির জন্যে 'মহাপূজা' সাদরে গৃহীত হ'ল। এতে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার থেকে দেশ-মাহাত্ম্য প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। সঙ্গীতের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর আন্তরিক ভাব প্রকাশ করেছেন। 'মহাপূজাই' গিরিশের জাতীয়তাবাদ প্রচার মূলক নাটক সৃষ্টির ভূমিকা।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে জনগণকে মুগ্ধ ও বিচলিত করেন। ১৭৯৭ সালে বিবেকানন্দ তাঁর কর্মবাদ প্রচার শুরু করেন। দেশসেবাই ধর্ম, মানবসেবাই জীবনের মহত্তর কর্ম—এই ধ্যানধারণার ধর্ম ও স্বদেশমন্ত্র একই পর্যায়ভুক্ত হ'ল। বাঙ্গালীর জীবনে এক নব স্পন্দন অনুভূত হ'ল।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গ ভঙ্গ করলেন। বাংলার ঘরে ঘরে প্রতি বাঙ্গালীর ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হ'ল। প্রকাশ্যে ইংরাজ-বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হ'ল। ১৯০৬ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরাজের দাবী উপস্থিত করা হ'ল। চিত্তরঞ্জন দাস, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত বাংলার বুকে দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিলেন। লোকমুখে প্রচারিত, যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গিরিশকে মঞ্চে জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য অনুরোধ করেন। গিরিশ সে অনুরোধ আদেশ মনে ক'রে মাথা পেতে নিয়েছিলেন। এই আদেশ ও অনুরোধ রক্ষার ফল 'সিরাজদৌল্লা' ও 'মীর কাশিম'।

অবশ্য এ দু'খানা নাটকই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা। তবে গিরিশচন্দ্র মুখ্যত ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাব প্রকাশক নাট্যকার এবং এ দু'খানা নাটকও মূলত দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণে রচিত ব'লে, এরাও ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ প্রচারমূলক সাহিত্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি দাবী করতে পারে। এ কারণেই এ নাটক দু'খানার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হ'ল।

১৯০৬ সালের ১০ই জানুয়ারী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক প্রকাশিত হয়। গিরিশ প্রতিভার যে স্ফুরণ এই নাটকের মাধ্যমে আমরা পাই, সে সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার লিখেছেন ঃ

"গিরিশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম, খাঁটি বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেম, তাহার বহু নীতি গভীর দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত। তাঁহার দেশানুরাগে কোন বিলাতীর নামমাত্র গন্ধ নাই, খাঁটি বাংলার জলমাটির উহা অনুরূপ। গিরিশচন্দ্র যে স্বদেশ-প্রেম প্রচার করিয়াছেন তাহার প্রথম ভিত্তি জাতির আত্মবোধ জাগরণে, পথ আত্মনির্ভরশীতলতায় ও আত্মত্যাগে, বিকাশ আত্মবিকাশে।"[১]

সিরাজদ্দৌলা নাটক প্রকাশিত হবার অনেক আগে থেকেই গিরিশের মনে দেশাত্মবোধের অঙ্কুর বিকশিত হ'তে দেখি। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'গরুড়' নামক প্রবন্ধে তিনি প্রথম মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করেন। ১৮৯০ সালে 'মহাপূজার' ভেতর দিয়ে দেশমাতৃকাকে ভক্তি অর্ঘ্যে আহ্বান জানান। ১৮৯৮ সালে রচিত তাঁর 'মায়াবসান' নাটকে পাই নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় আত্মচেতনাবোধ জাগরণের প্রয়াস। "মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন, বড় লোক বড়লোক একত্র হ'য়েছেন, যে মদ খাবে তাকে শাসন করুন, নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের উপরে দেখেছেন, দীন, দরিদ্র প্রভৃতি ইংরাজী চালে চলে, আয় অনুসারে ব্যয় করতে পারে না। তাতে যে কি সর্বনাশ হচ্ছে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন। এমন কুটির নাই, যেখানে মদের বোতল, শিল্প বোতাম, সাবান, এসেন্স নাই। যদি বড়লোক একত্র হ'য়ে থাকেন, সাধারণকে স্নীতি শিক্ষা দিন। পরহিতাচারী হতে বলুন। বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে সেই টাকায় দীন-দরিদ্রের সাহায্যে করুন। [১ম অঃ ৫ম গঃ]

আমারা দেখতে পাই এ জাতীয় উপদেশের ভিত্তিতেই গঠিত হ'য়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূলনীতি।

১৯০৬ সালে দাদাভাই নৌরজীর পরিচালনাধি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এবং দেশে ব্যাপক ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচার কর্ম চলতে থাকে। বাংলার বুকে বৃটিশ লেখনীতে কলঙ্কিত সিরাজ চরিত্রকে বুকের উষ্ণ অনুভূতি দিয়ে গিরিশ পরম শ্রদ্ধাবান দেশপ্রেমিক রূপে দশের সামনে তুলে ধরলেন জাতীয় বীররূপে। সিরাজ গিরিশের হাতে শুধু নব জীবন লাভ করলেন না; শৌর্য, বীর্য, দেশপ্রেম ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি রূপে বাঙ্গালীর অন্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি হিসেবে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'লেন।

১. গিরিশ প্রতিভা — ডঃ হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত পৃঃ ২১৯

'সিরাজুদ্দৌলা' নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন। গোলাম হোসেন প্রণীত খায়েরুল মুতাক্ষরীন, রিয়াজসসালাতিন, আমির 'হিন্দুস্থান', হলওয়েল লিখিত বিবরণ, Hasting's Messages in British Museum, ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস, Scrafton's Ives Journal, Despatches to Court of Directors, letters from Clive & Watson, Mill's History of British India, Hunter's Statistical Account of India প্রভৃতি থেকে যেমন গিরিশচন্দ্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তেমনি বিহারীলাল সরকার, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, নিখিল নাথ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালী রচিত বাংলার নবাবের ইতিহাসকেও তিনি সশ্রদ্ধ অন্তরে নাট্য উপাদানরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নায়ক সিরাজুদ্দৌলা ধীরোদাত্ত গুণ-বিশিষ্ট নায়ক। তাঁহার চরিত্রে একদিকে উদার্য ও কোমলতা ও অন্যদিকে বীরত্বব্যঞ্জক মনোভাবের সম্মিলন দেখা যায়। সিরাজের নবাবী পাওয়ার পূর্ব জীবনের কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস মাত্র নাট্যকার দিয়েছেন।

মনে হয় সিরাজ চরিত্রের দুর্বলতাটুকু নাট্যকার জাতীয় বীরের চরিত্র থেকে সযত্নে বিসর্জন দিয়েছেন। সিংহাসন পাবার পর সিরাজ চরিত্রের আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। সেই পরিবর্তিত স্বাধীনতা পিয়াসী বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রই গিরিশচন্দ্র গভীর সহানুভূতি ও নিবিড় শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। ষড়যন্ত্র লোলুপ, ক্ষমতাপিপাসু অমাত্যবর্গের ঘৃণ্য মন্ত্রণা ও বিদ্রোহী মনোবৃত্তি সিরাজের অন্তর বিক্ষুব্ধ করে তুলল। তাই সিংহাসন লাভের পর সিরাজ মাতামহীকে বলেছেন ঃ

> তব আজ্ঞা হবে না লঙ্ঘন,
> প্রতি গৃহে আপনি যাইয়ে
> করির সম্মান সবে।
> কিন্তু তাহে না ফলিবে ফল,
> কুটিলতা কুটিল না করিবে বর্জন" [১ম অঃ ২ গঃ]

সিংহাসন লাভের পর একদিকে শওকত জঙ্গ ও ইংরাজ বহিশত্রু, অন্যদিকে গৃহশত্রু ঘেশেটি বেগম ও অমাত্যবর্গ তাঁকে মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে কাল কাটাতে দেয়নি। তবুও দেশপ্রেমে সিরাজ-অন্তর পূর্ণ। বিদেশীর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্যে তিনি শত্রুমিত্র সবার

দ্বারস্থ হলেন, নত মস্তকে সাহায্য প্রার্থনা করলেনঃ "হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু মনে করবেন না। কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাংলার শত্রু নই। আপনাদের যদি বর্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের আত্মীয়, বন্ধু, স্বদেশনিবাসী নির্বাচিত হবে, কোনও বিদেশী রাজকার্য প্রাপ্ত হবে না। হিন্দু-মুসলমানগণ এক স্বার্থে বাংলায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্তে বঙ্গবাসীই ভারপ্রাপ্ত হবে। যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন, পূর্ণিয়ার সওকত জঙ্গের সঙ্গে যোগদান করুন কিম্বা বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন করে যোগ্যজনকে সিংহাসন অর্পণ করুন। কিন্তু স্থির জানবেন ফিরিঙ্গি বাংলার দুষমন।" [১ম অঃ ৫ম গঃ]

সিরাজের মুখ-নিঃসৃত এ বাণীই ছিল সেদিন সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অন্তর্নিহিত সত্য অনুভূতি। নাটকের পরিণতিতে শেষবারের মত দেশ-রক্ষার জন্যে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্যে মীর জাফরের কাছে নতজানু হয়ে মিনতি করতে দেখতে পাইঃ "সেনাপতি আর বিরূপ কেন? এ সময়ে কেন আমাকে পরিত্যাগ কর্চ্ছেন? আমি বারবার আপনাদের বলেছি, আমায় যদি অযোগ্য বিবেচনা করেন, আমায় রাজ্যচ্যুত করে যোগ্য ব্যক্তিকে রাজ্য প্রদান করুন। এই দেখুন, এই রাজ মুকুট আপনার পদতলে স্থাপন কচ্ছি আপনি স্বয়ং গ্রহণ করুন। আসুন, আমি সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলে আপনাকে অভিবাদন কচ্ছি। আপনি নবাবের মর্যাদা, মুসলমানের মর্যাদা, বাংলার স্বাধীনতা আজ যুদ্ধে রক্ষা করুন। আর বিরূপ হবেন না, সকলই যাবে, আজই বিধর্মী, বিজাতীয়ের পদানত হতে হবে। বাংলার গদি ফিরিঙ্গির পায়ে অর্পণ করবেন না।" [৪ অঃ ২ গঃ] এ যেন দেশবাসীর প্রতি সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রনাথের করুণ, আকুল আহ্বান।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতৃভক্ত সন্তান এবং বিশ্বস্ত কর্মচারীদের আদর্শ স্নেহপ্রবণ নবাব—ক্ষমা এবং উদার্য গুণে মহৎ। কিন্তু সিরাজ ট্রাজিডির নায়ক। তার চরিত্রে কিছু দুর্বলতার প্রয়োজন। নইলে কোন সূত্র বেয়ে নিয়তি তার নিষ্ঠুরতম আঘাত সিরাজের বুকে হানবেন! নাট্যকার সুকৌশলে সিরাজ চরিত্রে হু'টি দুর্বলতা দেখিয়েছেন। একটি অকস্মাৎ অপরিমিত ক্রোধের উদয়, অপরটি অকারণ, অস্বাভাবিক ইংরাজভীতি। দ্বিতীয় দুর্বলতা কাপুরুষতায়

পরিণত হ'য়ে সিরাজ চরিত্রকে সামঞ্জস্যহীন ক'রে তুলেছে। মীরমদনকে সম্বোধন ক'রে সিরাজ বলেছেন—"মীরমদন, মীরমদন, আমি ভীত নই। দুর্গম রণ-সন্ধিতে আমাকে নির্ভয়ে প্রবেশ করতে দেখেছ, কিন্তু ফিরিঙ্গি নামে আমার দেহ কম্পিত হয়। সহস্র সহস্র তোপ ধ্বনির মধ্যে যদি একটি ইংরাজের তোপের শব্দ হয়, আমি তা বুঝতে পারি—সে শব্দে আমার আপাদ মস্তক কম্পিত হয়। [২অঃ ৬গঃ]

এ দুর্বলতা বাল জনোচিত কাপুরুষতা, সিরাজের মত দেশপ্রেমিক বীরের চরিত্রের দুর্বলতাও তার সঙ্গে সঙ্গতি ও সামাঞ্জস্য রেখেই আরোপ করা নাট্যকারের উচিত ছিল। সেজন্যে 'সিরাজুদ্দৌলা' ট্রাজিডি হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার নিশ্চিত পরিণামে নিয়তির নিষ্ঠুর খেয়ালে, গিরিশসৃষ্ট দুর্বলতার পথ বেয়ে নয়।

এ নাটকে দু'টি কাল্পনিক চরিত্র জহরা ও করিম চাচাকে গিরিশ অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে ঐতিহাসিক নিষ্ঠাচ্যুত হ'য়েছেন। এ ছাড়া উভয় চরিত্রেই কিছুটা অলৌকিকতা আরোপ ক'রে ঐতিহাসিক নাটকের সত্যনিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠা উভয় থেকেই দূরে সরে গেছেন।

গদ্য এবং গৈরিশ রীতির অমিত্রাক্ষর ছন্দে এ নাটক রচিত।

সমসাময়িক ভাবকে রূপ দিয়ে যে গিরিশচন্দ্র প্রভূত যশের অধিকারী হ'য়েছিলেন, সমালোচকের লেখনীতেই তার পরিচয় মেলে ঃ[১]

'If we accept Dr. Brander Mathew's contention that the greatest dramatist of a period when drama has flourished, has always produced his plays for performace in the theatre of his own time, by actors of his own time, and for the spectators of his own time, Girish chandra ghose can, with perfect justice be acclaimed as a really great dramatist''

সমসাময়িক বঙ্গমানসে যে সিরাজুদ্দৌলা নাটক উদ্দাম দেশপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত করেছিল, তা তা'র জীবনীকারের বর্ণনাতেও পাই ঃ[২]

১: **The Bengali Drama, its origin & development—Dr. P. Guha thakurta P 137**

২. গিরিশ প্রতিভা—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পৃঃ ২২০

"সমগ্র জাতীয় মহাক্ষেত্র হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া অভিনয় ক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলাম আমার বাংলা কত বড়, আর এই বাংলার বীর সিরাজ ও কাশিম আলীর দেশপ্রেম কত গভীর কত জীবন্ত, জ্বলন্ত ও কত মর্মস্পর্শী··· ইহার পর দেশাত্মবোধের কত কথা কত স্থলে পড়িয়াছি, কিন্তু বাংলার ইতিহাস সেই সময় প্রথম শিখিয়া বাংলার কথা যাহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছি, তাহার প্রভাবেই বাংলা হইতে যখন দেশমাতৃকার আহ্বান প্রথমে আমার মর্মে পঁহুছিল, সেই আহ্বানে 'আকুল করিল মোর প্রাণ।' মোহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম, আর ঘরে থাকিতে পারিলাম না।"

স্বদেশপ্রেম ও স্বরাজপ্রীতি প্রচার কল্পে গিরিশের পরবর্তী নাটক 'মীর কাশিম' হতভাগ্য সিরাজের ন্যায় শেষবারের মত ইংরাজের কবল থেকে যে বাংলাকে মুক্ত করতে চেয়েছিল, সেই হতভাগ্য নবাব কাশিম আলীর জীবনী নিয়ে এ নাটক রচিত। সমস্ত বিলাস ব্যসন পরিত্যাগ করে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত করবার জন্যেই তাঁর ব্রত গ্রহণ। তাঁর সহজ সরল জীবন যাত্রায় যেন ভারতদেশহিতব্রতে দীক্ষিত সত্যাগ্রহীর জীবনের ছাপ পাই। মীর কাশিম ইব্রাহিমকে বলেছেঃ 'এসো একত্রে আহার করিগে চলো। আমার সামান্য আহার, সামান্য ভোজ্যবস্তু—আমার সহিত একত্র ভোজন করবার নিমিত্ত অপর কোনও ব্যক্তিকে আহ্বান করতে সাহস হয় না। (৩ অঃ ৬ গঃ)
অন্যত্র বলেছে— 'আমি নিঃস্ব নবাব, নবাবী যে বৈভব সে আমার নয়—রাজ্যের, আমার রাজভোগ অতি সামান্য ব্যক্তিও ঈর্ষা ক'রবে না। মূল্যবান রাজ-পরিচ্ছদ—সামাজিক প্রয়োজন তাই।" (৩ঃ অঃ ৬ গঃ)

এরূপ সবৈশ্বর্য বিলাস ব্যসন ত্যাগী নেতা বাংলা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল। এই কালেই আবির্ভাব হয়েছিল রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দের। এঁদের মাঝেই নাট্যকার কাশিম আলীকে জীবন্ত প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় গিরিশ তাঁর জীবদ্দশায় এ নাটক দু'খানার অভিনয় দেখে যেতে পারেন নি। সিরাজুদ্দৌলা নাটক অভিনয়ের কালে সরকারী পরওয়ানা এসে অভিনয় বন্ধ করে দেয়। লোকে লোকারণ্য প্রেক্ষাগৃহ শূন্য হয়ে যায় পুলিশ অত্যাচারের ভয়ে। গিরিশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

উদ্যোগী নাট্যকার ক্ষান্ত হলেন না। গুরুর উপদেশ মত অক্লান্ত সাধনায় রত থেকে রূপ দিলেন কাশিম আলীর। কলিকাতার পথে পথে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্র পড়লো। কিন্তু এক প্রভাতে দেখা গেল, পুলিশের লাল কালিতে তা কাটা পড়ে গেছে। অর্থাৎ মীর কাশিম নাটকও অভিনীত হতে পারে নি।

নূতন উদ্যমে গিরিশ 'ছত্রপতি শিবাজী' রচনা করলেন। কিন্তু সিরাজুদ্দৌলা ও মীর কাশিমে যে সর্বধর্ম সমন্বিত দেশপ্রেমের বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন, সে বাংলা দেশ হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়, সে বাংলা বাঙ্গালীর। ছত্রপতিতে সে সার্বভৌমিত্ব বিনষ্ট হ'ল। তাছাড়া ছত্রপতি নাটকে দেশপ্রেমের থেকে ধর্মচেতনা ও প্রেরণাই নাট্যকারকে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্বদেশপ্রেম ও প্রীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিংশ শতাব্দীর বহু নাট্যকারই ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা করেন। তাঁদের ভেতর দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষিরোদ প্রসাদ সমধিক প্রসিদ্ধ। ডি, এল, রায়ের প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন ও ক্ষিরোদ প্রসাদের মহারাজ নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি নাটক জাতির মনে দেশপ্রেমের সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। এ ছাড়া নবীনযুগে মন্মথ রায়, শচীন সেন, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতিও এ পথে বিচরণকারী। তবে এঁরা সবাই বিংশ শতাব্দীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ বলে, বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নন।